সুবোধ চক্রবর্তী

স্ফুলিঙ্গ



স্ফুলিঙ্গ

সুবোধ চক্রবর্তী

যোগমায়া প্রকাশনী
৬০ পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ॥ ২৩ জানুয়ারী। ১৯৮৫
(নেতাজীর আবির্ভাবের পুণ্য স্মৃতি-বিজড়িত লগ্নে)

দ্বিতীয় প্রকাশ ॥ ফেব্রুয়ারী। ১৯৮৬

প্রকাশক ॥ শ্রীমতী শ্যামলী ঘোষ
এল. আই. জি. বিলডিং
ব্লক—সি, ফ্ল্যাট—তিন
৪৯, নারকেলডাঙ্গা নর্থ রোড
কলিকাতা-৭০০০১১

যোগমায়া প্রকাশনী সিটি অফিস ॥
৬০ পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রাকর ॥ শিব শঙ্কর প্রেস
৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

মূল্য ॥ আট টাকা ॥

॥ উৎসর্গ ॥

স্বাধীনতা সংগ্রামের দুর্বার প্রাণশক্তি
ও মহান আত্মত্যাগের মহিমায় বর্তমান
প্রজন্মের তরুণ তরুণীগণ দেশপ্রেমে
অনুপ্রাণিত হবেন সে আশায় তাঁদেরই
উদ্দেশে—



ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের মৃত্যুঞ্জয়ী নায়ক বিনয়-বাদল-দীনেশ।

॥ প্রসঙ্গ স্ফুলিঙ্গ ॥

কিছু কিছু মানুষ থাকেন যাঁরা আত্মপ্রচারে আগ্রহী নন। অথচ তাঁদের কর্মকে সত্যের আলোকে আপন মহিমায় উদ্ভাসিত করতে পারলে আমরা তৃপ্ত হই—বিদগ্ধ মানুষও খুশী হন। শ্রীসুবোধ চক্রবর্তী একজন প্রবীণ বিপ্লবী। যে সমস্ত মানুষের অনেক পরিশ্রমে, অনেক কষ্টের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি তিনি তাঁদেরই একজন। ইতিপূর্বে তাঁর আত্মকথার প্রথম পর্ব 'ওরা বিপ্লবী আমি ফেরার' আমরা প্রকাশের পর জন-সমাদর লাভ করেছে।

বাংলা পত্রপত্রিকার ইতিহাসে প্রবর্তক পত্রিকাটি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এই পত্রিকাটির প্রকাশক ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মতিলাল রায়। জন্ম, ১৮৮২ সালের ৬ই জানুয়ারী। ইনি প্রকৃত-পক্ষে উত্তরপ্রদেশের চৌহানবংশীয় ছেত্রী রাজপুত ছিলেন। কিন্তু তাঁর পরিচয় বাংলা ও বাঙালীর জীবনে একটি অনন্য স্থান অধিকার করে আছে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ রোধ। আন্দোলনে মতিলাল যোগ দেন। ১৯১০ সালে শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগরে তাঁর বাড়িতে আত্ম-গোপন করেছিলেন। এই সময় জ্ঞান-ভক্তি ও কর্মযোগ সম্বন্ধে তিনি মতিলালকে সম্যক উপলব্ধির আলোয় নিয়ে আসেন। ১৯০৮ সালে এই মতিলালই নরেন গোঁসাইকে হত্যা করার জন্য কানাইলাল দত্তকে রিভলবার দিয়েছিলেন। বারীন ঘোষের দল ভেঙে যাবার পর শ্রীশ ঘোষ, অমর চট্টোপাধ্যায় ও বাবুরাম পরাকরের নেতৃত্বে মতিলাল চন্দন-নগরে বিপ্লবী সংগঠনের কাজ চালান। ১৯১৪ সালে প্রবর্তক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয় আর ঐ সঙ্ঘেরই মুখপত্র হিসাবে প্রবর্তক পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালে। এই প্রবর্তক সঙ্ঘই ছিল বাংলার বিপ্লবীদের একমাত্র আশ্রয় স্থল আর যোগাযোগ রক্ষার কেন্দ্র। শুধু বাংলা নয় ভারতের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীরাও কোন না কোন সময়ে এই গোপন আশ্রয়ে কাটিয়ে গেছেন। এছাড়া ছিল প্রবর্তক বিদ্যাপীঠ। মহাত্মা-জীর অসহযোগ আন্দোলনের সময় অনেকে এই বিদ্যাপীঠে যোগ দেন।

মতিলাল সঙ্ঘগুরু ও তাঁর সহধর্মিনী রাধারাণী দেবী সঙ্ঘমাতা হয়েছিলেন। এমন কি জাতিকে স্বাবলম্বী করে তোলার উদ্দেশ্যে মতিলাল প্রবর্তক ট্রাস্টও গঠন করেছিলেন। ট্রাস্টের পরিচালনাধীন ছিল পাঠশালা, জুনিয়র বেসিক স্কুল, গ্রন্থাগার, আবাসগৃহ সহ বিদ্যার্থি ভবন-আশ্রম, মহিলা সদন, শ্রীমন্দির, ব্যাঙ্ক, প্রকাশন সংস্থা, আসবাবপত্র ও ছাপাখানা সংক্রান্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এমনকি জুট মিলও।

সুদীর্ঘকাল ধরে প্রবর্তক পত্রিকাটি সাহিত্য ক্ষেত্রে তার স্থানটি অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। অবশেষে তার বিলুপ্তিও ঘটেছে। ইতিমধ্যে সম্পাদনার দায়িত্ব বদল হয়েছে বারবার। শুধু তাই নয়, বর্তমান কালের বহু সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকই প্রবর্তক পত্রিকার মাধ্যমে তাঁদের সাহিত্য জীবনকে সমৃদ্ধ করেছেন।

প্রবর্তক পত্রিকার ৪২ বর্ষের ২য় সংখ্যা অর্থাৎ বৈশাখ ১৩৬৪ সন থেকে সুবোধ চক্রবর্তীর এই কাহিনীটি 'অগ্নিক্ষরা' নাম দিয়ে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে।

অলিন্দ যুদ্ধের তিন শহীদ বিনয়-বাদল-দীনেশ। তাঁদের ঘিরে আমাদের অনেক প্রশ্ন, অনেক জিজ্ঞাসা। অনেক গ্রন্থও এ পর্যন্ত রচিত হয়েছে তাঁদের ওপর। কিন্তু আমাদের দাবী একটাই—'অগ্নিক্ষরা'র রচনাকাল আজ থেকে বেশ কিছুকাল আগে। বিপ্লবের স্বর্ণযুগ থেকে স্বাধীনতায় উত্তরণের লগ্নেরও কিছু পরে। এই রকম অবস্থায় তখনও পর্যন্ত অলিন্দ যুদ্ধের নায়কদের নেপথ্য প্রামাণ্য ইতিহাস রচিত হয়নি। 'অগ্নিক্ষরা' (স্ফুলিঙ্গ) সেই প্রথমত্বের দাবী করতে পারে। আর আমাদের বিশ্বাস সৎ ও সুন্দরের ক্ষয় নেই, বিলুপ্তি নেই। এ কাহিনী চিরকালের। আমরা সেই বিপ্লব কাহিনী গ্রন্থাকারে গ্রথিত করে অমর স্মৃতিতে প্রণতি জানাচ্ছি! গ্রন্থটির ২য় সংস্করণ প্রকাশে আমরা গর্বিত।

বিনীত

যোগমায়া প্রকাশনী

॥ আমার কথা ॥

প্রায় ত্রিশ বছর একটি লেখা আলমারিতে বন্দী হয়ে থাকার পর হঠাৎ বই হয়ে আত্মপ্রকাশ করছে কেন? সত্যিই কি কোন বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে বর্তমান পরিস্থিতিতে?

এ প্রশ্নটা এসে উপস্থিত হয়েছিল আমার নিজেরই কাছে।

মাসিক প্রবর্তক কাগজে যখন লেখাটি প্রকাশিত হয় তখন ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের লেখা 'সবার অলক্ষ্যে' প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সে বইতে বিনয়-বাদল-দীনেশ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পরিবেশিত হয়নি। অতি সংক্ষেপে মূল ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রবর্তক সম্পাদক রাধারমণ চৌধুরী আমার লেখা অতি আগ্রহ সহকারে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করেন, এবং এক বছরের প্রবর্তক বাঁধাই করে আমার হাতে দিয়ে বলেন: নিজের লেখা যত্ন করে রাখা তো আপনার স্বভাব নয়। এ ব্যাপারে আপনি একেবারেই উদাসীন।

কথাটা মিথ্যা নয়। হয়তো কোন দিনই মুক্তি পেত না, যদি না হঠাৎ আমার পরম স্নেহভাজন ডাক্তার গৌতম পাল এ কাণ্ডটি করে বসত। লেখাটি পড়ার পর সে আবদার জানায় যে এ লেখা বই করতে হবে।

আমি অবাক হলাম। বললাম: এমন অদ্ভুত কথা তোমার মনে হলো কেন? সে দ্বিধাহীন ভাবে বললো: বিনয়-বাদল-দীনেশ সম্পর্কে লেখা সব বই-ই আমি পড়েছি। এমন কি বিপ্লবী লেখক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের লেখা 'সবার অলক্ষ্যে'-ও বাদ যায়নি। কিন্তু আপনার লেখা অনেক বেশী তথ্য সমৃদ্ধ। কাজেই পুস্তকাকারে আত্মপ্রকাশ করলে পাঠক সমাজ উপকৃত হবেন।

বস্তুতঃ গোপন বিপ্লবী আন্দোলনের ঘটনা সমূহ সাধারণ লেখকের কাছে, এমন কি নিজ দলের সভ্যের কাছে-ও সুলভ নয়। কারণ গোপনতার আবরণ এতই কঠিন যে সহজে তা ভেদ করা যায় না। বিপ্লবী দলের 'এ্যাকশন' হবার পর পুলিশ তৎপর হতো। তার আগে

একবারেই অন্ধকারে থাকতো। ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া দলের অন্য সদস্যের জানার অধিকার-ও স্বীকৃত নয় বলে গোপন তথ্যগুলি গোপনেই থেকে যায়। এমনকি পরিবর্তিত অবস্থায়-ও তাঁরা মুখ খুলতে চান না।

রডা কোম্পানীর একগাড়ী অস্ত্র একবারে ম্যাজিকের মত উধাও করে দেন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স-এর নায়ক হরিদাস দত্ত। ঢাকায় লোম্যান ও হড্‌সনকে গুলি করে, বিনয় সুপতি রায়-এর সাহায্যে কোলকাতা চলে আসেন। হরিদাস দত্ত তাঁকে নিয়ে যান রাণীগঞ্জ কয়লাখনি এলাকায় কাটরাজগড় নামক স্থানে, একেবারে নিরাপদ আশ্রয়ে। তারপর মহাকরণ আক্রমণের কর্মসূচী গৃহীত হলে হরিদাস দত্তই তাঁকে নিয়ে আসেন রাজেন গুহের বেহালার বাড়ীতে।

হরিদাস দত্ত দলের মেজদা নামে পরিচিত। মেজদার কাছ থেকে অনেক ধৈর্য ধরে, অনেক হাটাহাটি করে যেসব তথ্য সংগ্রহ করি তা অপরের জানার কথা নয়। সুপতিদার ঘটনা সমূহ আগেই জানা গেছে। আর সব শেষে যাঁর নাম উল্লেখ করবো তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সাথী মেজর সত্যভূষণ গুপ্ত। সত্যদার কাছ থেকে জেনেছি যে এ 'এ্যাকশন'-এ স্বয়ং সুভাষচন্দ্রের কেবল অনুমতিই ছিল না, বিনয়কে বিদেশে পাঠিয়ে দেবার পরিকল্পনা তিনিই করেছিলেন বিনয় ঢাকা থেকে কোলকাতা চলে আসার পরই।

ভূপেনদা আমার লেখা পড়ে জানতে চেয়েছিলেন যে এত তথ্য আমি কোথায় পেলাম। আমি মেজর গুপ্ত ও মেজদার নাম করতেই খুশী হলেন তিনি। বললেন মেজদার কাছ থেকে কথা বের করা কঠিন ব্যাপার।

কিন্তু এ কাহিনী 'উপন্যাসের চেয়ে-ও সুখপাঠ্য' এ কথা কতটা সত্য তার যথার্থতা বিচার করবেন পাঠক সমাজ।

২৩শে জানুয়ারী। ১৯৮৫ — সুবোধ চক্রবর্তী

শান্তিপুর॥

অকস্মাৎ একেবারে হৈ-হৈ পড়ে গেল ডালহৌসী স্কোয়ার এলাকায়। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে পথিকের দল, চারদিকের অফিসগুলোর জানালা-দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, অপেক্ষমান মোটরগাড়ীর সোফার সার্সি তুলে দিয়েছে, দাঁড়িয়ে গেছে ট্রাম, দাঁড়িয়ে গেছে বাস, দাঁড়িয়ে গেছে ট্যাক্সি!

কোলকাতা সহরের কর্মচাঞ্চল্যের মর্মস্থলের সুশৃঙ্খল আবহাওয়ার মধ্যে অপ্রত্যাশিত ভাবে, একেবারে অকস্মাৎ একি বজ্রপাত? যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের যাদুদণ্ডস্পর্শে একেবারে প্রস্তরীভূত হয়ে গেছে সমগ্র ডালহৌসী স্কোয়ার আর সেখানে উন্মাদের মত ছুটোছুটি করে মরছে লাঠিয়াল পুলিশ, সার্জেন্টের মোটর সাইকেল, সশস্ত্র পুলিশের ভ্যান, পাঠান অশ্বারোহী আর দু'চারখানা সাঁজোয়া গাড়ী।

সমস্ত লালবাজার ভেঙ্গে পড়েছে ডালহৌসী স্কোয়ারের বুকে। মুহূর্তে সেই শান্ত এলাকা পরিণত হয়েছে ওয়াটারলু রণক্ষেত্রে।

কিন্তু সবারই দৃষ্টি নিবদ্ধ সম্মুখে দণ্ডায়মান বাংলা সরকারের প্রধান দপ্তর রাইটার্স বিল্ডিংস্-এর প্রতি, তার দ্বিতলের অলিন্দের দিকে।

কি বিপর্যয় ঘটে গেছে সেখানে?...

চলে অনুচ্চ কণ্ঠে কথোপকথন।

সাহেবগুলো সবই সাবাড়।

সব না হলেও গোটাকতক তো হবেই। কিন্তু কারা করলো?

জানি না। তবে শুনছি তারাও সাহেব, তিনটি সাহেব। বোধ হয় এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান।

বোধ হয় খ্রীষ্টান।

কিন্তু কি করে গেল দোতলায় ?—প্রশ্ন করেন একজন।···

মরতে যারা যায়, তাদের কি আর ঠেকিয়ে রাখা যায় কখনো ? —কে যেন জবাব দেয়।

এগিয়ে আসেন একজন বৃদ্ধ : তিনজনই মরে গেছে ?—তাঁর কণ্ঠে সীমাহীন বেদনার আর্তনাদ !

পেছন থেকে বলে ওঠেন একজন যুবক : পটাসিয়াম সাইওনাইড খেয়ে জীবনদান করেছে সুধীর গুপ্ত, কিন্তু মরবার জন্য গুলী চালিয়েও এখনও মরেনি দীনেশ গুপ্ত আর মরেনি মেজর বিনয়কৃষ্ণ বসু।

বিনয়কৃষ্ণ—মানে ঢাকার—

বাধা দিয়ে বলে যুবক : হ্যাঁ, ঢাকার বিনয় বোস। লোম্যান হত্যাকারী বিনয় বোস। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স-এর মেজর বি. কে. বসু !······

১৯৩০ সনের সেদিন ৮ই ডিসেম্বর। বেলা প্রায় একটা।

* * * *

এই অবিস্মরণীয় অধ্যায়ের মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে বাংলা ১৩১৩ সনের ভাদ্র মাসের এক নিশীথ রাত্রে ক্ষীরোদহাসিনী দেবীর কোল আলো করে এলেন বিনয়কৃষ্ণ বসু।

পরিবারের সবাই খুশীতে উচ্ছল হয়ে ওঠে। রাউৎভোগ গ্রামের এই সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে আনন্দের বান ডাকে। পিতা রেবতী বসু শিশু বিনয়কে কেন্দ্র করে এক অজানা আনন্দে ভেসে চলেন কল্পনার পাখা মেলে।

বর্ষার বিক্রমপুর ! চারদিকে জল থৈ থৈ করে। পদ্মার জল এসে ছড়িয়ে পড়ে গ্রামে গ্রামে। খাল, পুকুর ভরে গিয়ে, মাঠ-ঘাট ভাসিয়ে নিয়ে এক অপূর্ব জলতরঙ্গ সৃষ্টি হয়। মাঠে মাঠে সবুজ ধানের শীষ খেলা করে জল আর হাওয়ার সঙ্গে। নৌকো চলে পাল তুলে। মানুষ মাটির স্পর্শ ভুলে যায়—জল, শুধু জল।

মাতৃক্রোড়ে শিশু বিনয় বড় হল তিল তিল করে। যেমন করে বড় হয় আকাশের চাঁদ কৃষ্ণপক্ষের পরের রাত থেকে। হাসি আনন্দে

মায়ের দিন কেটে যায়। কত আশার আলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় মায়ের মন। ছেলের কথা ভাবতে মায়ের বুক ভরে ওঠে।

বিনয় বড় হয়ে ওঠেন। পাড়ার লোক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে এই প্রিয়দর্শন ছেলেটির দিকে।

'বিনয় নিশ্চয় একদিন মায়ের মুখ উজ্জল করবে', বলে পাড়ার মেয়েরা।

বিনয় সবার আদরের ধন! সাত ভাই পাঁচ বোনের মধ্যে বিনয় একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করেন। মা-বাবা ও কাকা সূর্যকুমার বসু (ঢাকেশ্বরী কটন মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর) সবাই বিনয়কে নিয়ে ব্যস্ত।

কি মিষ্টি চেহারা এই শান্ত বিনয়-নম্র ছেলেটির। মা-বাবা ছেলের চরিত্রের সঙ্গে মিল রেখে নাম রাখেন 'বিনয়'।

সার্থক এই নাম। সার্থক মা বাবা! ছেলের ভবিষ্যৎ এই নামের ভিতর দিয়ে যেন মূর্ত হয়ে ওঠে।

পাড়ার ছেলেরা যখন ঝগড়ায় মেতে ওঠে, বিনয় এসে দাঁড়ায় সবার মাঝখানে মুখে মধুর হাসিটি নিয়ে। ওকে দেখেই সবাই শান্ত হয়ে যায়, ঝগড়া থেমে যায়।

চরিত্রের দৃঢ়তায়, বিনয়-নম্র স্বভাবে বালক বিনয় সবাইকে মুগ্ধ করে। তার চরিত্রের অপূর্ব মাধুর্য প্রভাব বিস্তার করে সবার ওপর। সবাই একান্ত ভাবে ভালোবাসে বিনয়কে। বালক বিনয়ের চেহারায় এমন এক দীপ্তি যা সহজেই সকলকে আকৃষ্ট করে। অনেক লোকের মাঝখানে থেকেও তাঁর বৈশিষ্ট্যকে লুকিয়ে রাখা যায় না। স্বল্পভাষী বিনয়ের নেতৃত্বকে স্বীকার না করে উপায় নেই। তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা, সহজ ও স্বাভাবিক প্রাধান্য পরবর্তী কালে বিপ্লবী দলের নেতা রূপে আত্মপ্রকাশ করে। বিনয় বসুর নেতৃত্ব সম্পর্কে দীনেশ গুপ্ত বলেছেন —'বিনয়দার নেতৃত্বে রয়েছে পূর্ণতা, এই নেতৃত্বই আমার জীবনকে কর্মময় করে তুলেছে।'

সুরু হলো ছাত্রজীবন। সহজভাবে পড়াশুনা করে চলেন। বেশী

সময় বই নিয়ে তাঁকে বসে থাকতে হয় না। সহজেই সব আয়ত্তে এসে যায়। অল্পদিনের মধ্যেই মেধাবী ছাত্র বলে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো।

সংসারে আর্থিক সচ্ছলতা তাঁর মনে কোনো রেখাপাত করতে পারেনি। চরিত্রে কোন ক্ষুদ্রতা স্থান পায়নি। মাটির পৃথিবীর গ্লানি স্পর্শ করেনি।

শরীরের কমনীয়তা যেন গলে গলে পড়ে—রাজার দুলাল।

কিন্তু মায়ের স্নেহ বুঝি অন্তর্যামী। মায়ের মনে বিনয়কে নিয়ে ভাবনা দোল খেয়ে যায়। সন্দেহ জাগে তাঁর ছেলের মৌন স্বভাবের অনন্যতায়। সহজ সরলতার আবরণে কোথায় যেন লুকিয়ে আছে কঠোরতা।

এত কি ভাবনা এতটুকু ছেলের! হঠাৎ যেন ভাবের দোলায় দোল খেয়ে কোনো অজানা রাজ্যে চলে যায়। সেখানে মা বাবার স্থান নেই।

ছেলেকে কাছে ডেকে মা নানা কথা জিজ্ঞেস করলেন। নিজের অজানা চিন্তাকে দূরে ঠেলে দিয়ে সহজ হ'তে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁর মনে কে যেন বলে দেয়, 'এ ছেলেকে ধরে রাখা যাবে না।' অমঙ্গলের আশঙ্কায় মার চোখে ধারা নেমে আসে। ঠাকুরের কাছে জানান মিনতি পুত্রের মঙ্গল কামনা করে।

পিতা রেবতীমোহন বসু ছিলেন পাকা শিকারী। শিকার করতে খুব ভালবাসতেন। শিকারের আনন্দে ভুলে যেতেন অন্য সব কিছু। শিকারের গল্প লেগেই থাকতো তাঁর মুখে। বন্দুকের নিশানা তাঁর ছিল অভ্রান্ত। ছেলে-মেয়েদের শিকারে উৎসাহ নেই বলে তাঁর মনে দুঃখ।

কিন্তু বিনয়! বিনয়কে তাঁর মন-মত করে গড়ে তুলতেই হবে। বিনয়কে কাছে ডেকে শিকারের গল্প করেন তিনি। বিনয় চুপ করে গল্প শোনেন, চোখে মুখে কোন বিস্ময় প্রকাশ পায় না। পিতা মনে করেন, ছেলে তাঁকে এড়িয়ে চলতে চায়। তাই তিনি হতাশ হয়ে শিকার প্রসঙ্গ বন্ধ করেন।

বিনয়কে ডাক্তারী পড়াতে হ'বে। ডাক্তারী পড়াবার পরিকল্পনা চলতে থাকে পিতার মনে। কল্পনা করেন ভবিষ্যতের। বিলেত থেকে ডাক্তার হয়ে ফিরে আসবে বিনয়। চারদিকে ছেলের নাম ছড়িয়ে পড়বে। ছেলের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কল্পনায় খুশী হয়ে ওঠেন পিতা।

ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র বিনয়। তাঁকে কেন্দ্র করে সহপাঠিদের মধ্যে একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন। সবার দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হলো এই ছেলেটির ওপর। ছাত্ররা ভাব জমাতে চায়। শিক্ষকরা আদর করে কাছে ডাকেন। বিনয় স্কুলে না এলে সহপাঠিদের আনন্দে ভাটা লাগে। ছুটির পর বাড়ী গিয়ে খোঁজ নেয় তাঁর।

বিনয় কথার জাল বুনতে জানেন না। কথার তুবড়ি ছুটিয়ে সহ-পাঠিদের মুগ্ধ করার কৌশল তাঁর জানা নেই। কিসের টানে তাহলে সবাই ওঁর কাছে আসে, ভালবাসে ?

যার দৃষ্টি উর্ধ্বে, ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করে যে কেবলই আকাশ পথে বিচরণ করে, তার চরিত্রের নির্মলতা ছড়িয়ে পড়ে চাঁদের আলোর মত সবার উপর। সেই আলোর টানে সবাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে মুক্ত আকাশের নীচে—ঘরের বন্ধন ভুলে যায়।

মৌন চাঁদ নিজেকে ছড়িয়ে দেয়, বিলিয়ে দেয় সবার মাঝে। চাঁদের আলোর সম্মুখে সবাই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—কবির মনে জাগে কল্পনা।

চাঁদকে সবাই ভালোবাসে। ভালবাসে তার স্নিগ্ধ পরশকে। চাঁদের স্পর্শ সবাইকে করে তোলে মুখর।

বিনয়ের স্পর্শে তাই ছাত্ররা হল মুখর—কথার ফুলঝুরি ঝরে।

ঢাকা সহরে তখন চলছিল বিপ্লবীদের গোপন প্রস্তুতি। হেমচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে শক্তিশালী বিপ্লবী দলের গোড়া-পত্তন চলছিল। চলেছে অতি গোপনে বেছে বেছে সভ্য সংগ্রহ করা। বিপ্লবীদের দৃষ্টি সহরের যুবকদের ওপর। স্কুল কলেজে চলেছে সভ্য সংগ্রহ করার গোপন কাজ। পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠেছে ক্লাব, গ্রন্থাগার।

ইংরাজ সরকারের সতর্কতার আড়ালে চলেছে এই প্রস্তুতি। অসংখ্য

গোয়েন্দার সন্ধানী দৃষ্টি এই গোপনতার আবরণ সহজে উন্মোচন করতে পারেনি। পারেনি বিপ্লবীদের গোপন ছন্দ আবিষ্কার করতে।

কিন্তু সেই শ্যেনদৃষ্টিকে সম্পূর্ণ ফাঁকি দিয়ে ১৪ বৎসর বয়সে দশম শ্রেণীর ছাত্র বিনয় 'স্বদেশী ভলান্টিয়াস''-এর সঙ্গে যুক্ত হন,—বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

এই 'স্বদেশী ভলান্টিয়াস'ই ১৮২৮ সনে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে 'বেঙ্গল ভলান্টিয়াস' নামে পরিচিত হয়

দুই

অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে নিজের ভেতরে অফুরন্ত শক্তির সন্ধান পান বিনয়।

রাত্রির নিস্তব্ধতায় বাড়ীর সবাই যখন গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন, বিনয় তখন তাঁর নিভৃত কক্ষে এক একটি করে বই পড়া শেষ করেন—কানাইলাল, ক্ষুদিরাম, ফাঁসির সত্যেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস।

পরাধীন দেশের মুক্তিদাতা বীর শহীদদের উদ্দেশ্যে জানান প্রণতি। দেশকে নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলে, সেই বিদেশী শাসকদের রক্ত চক্ষুকে অস্বীকার করে জাতীর ভীরুতার অপবাদ মুছে দিয়ে যাঁরা চলার-পথ রচনা করেছেন তাঁদের দেশপ্রেমের গভীরতার স্পর্শ লাগে বিনয়ের অন্তরে। নিজের ভেতরে এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা জেগে ওঠে। মনে মনে বলেন, 'এই তো আমার পথ, এই রক্তরাঙা বিপ্লবের পথেই আমার মুক্তি, দেশের মুক্তি।'

নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিপ্লবী দলের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। কাজেই কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলায় নিজেকে পরিচালিত করেন। দলের শৃঙ্খলা মেনে চলার জন্য তাঁর অপূর্ব নিষ্ঠা ত্যাগের পথে, আত্মাহুতি দেবার পথে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যায়। স্বেচ্ছায় নিজেকে বিলিয়ে দেবার ভেতর যে আনন্দ তার ছোঁয়াচ লাগে অন্তরে।

অতি গোপনে চললো তাঁর সাধনা। মনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরকেও

উপযুক্ত করে গড়ে তুলবার চেষ্টা চলতে থাকে। কুস্তির আখড়ায়, খেলার মাঠে সর্বত্রই নিয়মিত যাতায়াত সুরু হলো।

সমস্ত কাজ বিনয় সহজেই আয়ত্তে আনতে পারেন। তাই তো কুস্তিতে তিনি হয়ে উঠলেন ওস্তাদ নূতন নূতন মৌলিক কৌশল অবলম্বন করে অপর পক্ষকে সহজেই কাবু করে দেন। মুষ্টিযুদ্ধেও তিনি কম নন। টেনিস খেলাতেও তাঁর সুনাম।

বিনয়ের কৃতিত্ব ছড়িয়ে পড়ে সবার উপর। সবাই স্বীকার করে নেয় তাঁর নেতৃত্ব।

বিপ্লবের প্রস্তুতির জন্য চাই গোপনতা—নিখুঁত গোপনতা। পরাধীন দেশে যেখানে জনগণের কণ্ঠরোধ করে দেয়া হয়, অত্যাচারের ভয় দেখিয়ে, সেখানেই প্রয়োজন এই গোপন প্রস্তুতির। কিন্তু একদিন এই গোপনতার আবরণকে ফেলে বিপ্লবের মন্ত্র ছড়িয়ে পড়ে জনগণের মাঝখানে। তখন সেই ধাপ অতিক্রম করে আসতে হয় ডিমের ভেতরকার বাচ্চার মত। ডিমের বাইরের কঠিনতা ভেতরকার বাচ্চাকে বাঁচিয়ে রাখে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। তারপর একদিন এই কঠিনতা ভেঙেই বাচ্চার হয় মুক্তি।

বিনয় মুক্তির আনন্দে নিজেকে আড়াল করে রাখলেন। পরাধীন ভারতের মুক্তি সংগ্রামের সৈনিককে কতই না গোপনতার পথ অবলম্বন করতে হয়। কিন্তু বিনয় জানতেন এই গোপন সুড়ঙ্গপথে চলে চলে একদিন আলোর সম্মুখে এসে দাঁড়াবে বিপ্লবীদল।

স্কুলের পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চললো বিপ্লবের সাধনা। মা-বাবা ছেলের এই গোপন পথের সন্ধান কিছুই পান না। এমনি করে স্কুলের পড়া শেষ হয়ে গেল। প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করলেন বিনয়।

এবার সুরু হলো কলেজ জীবন। ঢাকা জগন্নাথ কলেজে আই. এস. সি ক্লাসে ভর্তি হয়ে ক্লাসের পড়ায় মনোনিবেশ করলেন।

কলেজেও তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়লো। অধ্যাপকগণ গৌরব করলেন এমন একজন ছাত্র পেয়ে।

বিনয়, অধ্যাপকদের যথার্থ সম্মান করে চলেন। আবার প্রয়োজনে অন্যায় আচরণের প্রতিবাদও করেন।

জগন্নাথ কলেজে বহু ছাত্রের সংস্পর্শে এসে বিপ্লব মন্ত্র তিনি ছড়াতে সুরু করলেন। একটি একটি করে ছেলেকে দলে টেনে আনেন। এমনি করে ঢাকা সহরে তাঁর নেতৃত্বে দলের সংগঠন পূর্ণতার পথে এগিয়ে চললো দ্রুত।

বিনয় জগন্নাথ কলেজ থেকে আই. এস. সি. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলেন।

পিতার ইচ্ছায় এবার তাঁকে ঢাকা মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হতে হলো। কিন্তু বিনয়কে গোয়েন্দা বিভাগ আরো সন্দেহ করতে সুরু করলো। তাঁর চলার ছন্দকে আবিষ্কার করার জন্য গোয়েন্দাদের তৎপরতার সীমা নেই।

গোয়েন্দা বিভাগে চাকরী করেন বিনয়ের এক আত্মীয়। তিনি একদিন গোপনে পিতাকে সাবধান করে দিয়ে গেলেন বিনয় সম্পর্কে।

কিন্তু এ যে বিশ্বাস করা চলে না। বিনয় সম্পর্কে নিশ্চয়ই গোয়েন্দা বিভাগ ভুল করেছে। এমন শান্ত-নম্র-বিনয়ী ছেলে কি করে বিপ্লবীদের সঙ্গে মিলে যেতে পারে? কিন্তু সত্যিই যদি বিপ্লবীদলের সভ্য হয়ে থাকে তা হলে···!

সমস্ত ভাবনাকে দূরে ঠেলে দিয়ে পিতা সহজ হ'তে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ভাবনাটি যেন কিছুতেই দূর হতে চায় না। বিনয়কে নিয়ে এত আশা তাঁর। কত-রঙ্গীন কল্পনা তিনি করেছেন ছেলেকে কেন্দ্র করে। সবই কি ব্যর্থ হয়ে যাবে? ছেলের ভেতর পিতা নিজের পূর্ণতা পেতে চান। তাইতো ছেলের অমঙ্গলের কথা চিন্তা করে পিতার মন ব্যথায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো।

ছেলেকে শাসন করতে হবে। কঠোরভাবে তাঁর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করবেন বলে পিতা অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সন্ধ্যার পর বিনয় বাড়ী ঢুকতেই তিনি ডেকে পাঠালেন ছেলেকে। বিনয় সহজভাবে পিতার কাছে এসে দাঁড়ালেন। একবার ছেলের

সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে নিলেন, তারপর দৃঢ়কণ্ঠে ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি নাকি বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছ ?'

পিতার প্রশ্ন শুনে বিনয় নিশ্চুপ। শুধু ছু'টি প্রশান্ত চোখে তাকিয়ে রইলেন পিতার দিকে। প্রশ্নের জবাব দিতে হলে তাঁকে বলতে হবে সত্য কথা। কিন্তু বিপ্লবের পথে প্রয়োজন একান্ত গোপনীয়তা। এই গোপনীয়তা বজায় রাখতে হলে পিতাকে কোন কথাইতো বলা চলে না। তাই বিনয় দাঁড়িয়ে রইলেন নিশ্চুপে। চোখ ছুটিতে ভেসে উঠলো অপূর্ব দৃঢ়তা, সমস্ত শরীরে পবিত্রতার প্রলেপ।

পিতা পুত্রের দিকে তাকিয়ে থেকে মুগ্ধ হয়ে গেলেন, ভুলে গেলেন তাঁর প্রশ্নের কথা। অপূর্ব এক আনন্দে তাঁর মন খুশীতে ভরে উঠলো।

ছেলেকে বিদায় দিয়ে খুশী মনে পিতা বাইরে চলে গেলেন। মা-বাবাকে লুকিয়ে কাজ করতে গিয়ে ছেলের মনে ব্যথার মেঘ জমে থাকে। কিন্তু সমস্ত ব্যথাকেই জয় করতে হবে বিপ্লবের পথে—সত্যের পথে।

বিনয় ভারাক্রান্ত মন নিয়ে পড়ার-ঘরে বই নিয়ে বসলেন। মা দাঁড়ালেন কাছে। ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'তুই নাকি স্বদেশীদের দলে যোগ দিয়েছিস ?' বিনয় রইলেন চুপ করে মাটির দিকে চোখ চেয়ে। ছেলেকে নীরবে বসে থাকতে দেখে মা চিন্তিতা হলেন। ব্যথাভরা ব্যাকুল কণ্ঠে আবার বললেন, 'ঐ তো পাশের বাড়ীর ছেলেরা স্বদেশী করে সারাটা জীবন জেলে জেলে কাটিয়ে দিলে। তুই যদি ঐ দলে যোগ দিয়ে থাকিস তা হলে তোর জীবনটাও তো জেলেই কাটবে।'

মার দিকে তাকিয়ে বললেন বিনয়, 'মা, জেলে জেলে জীবন কাটাবার জন্য তোমার ছেলের জন্ম হয়নি।'

অত্যন্ত খুশীর কথা! আনন্দের কথা! নিশ্চিন্ত হয়ে ছেলেকে আশীর্ব্বাদ করে মা বেরিয়ে গেলেন।

সত্যই তো কারাগারের সাধ্য কি বিনয়কে আবদ্ধ করে রাখে! মার কাছে তো ছেলে মিথ্যা কথা বলেন নি। তাঁর অন্তরলোক হ'তে

উচ্চারিত হয়েছে এই সত্য বাণী। বিনয় তাঁর বিপ্লবের সাধনায় যে সত্যের সন্ধান পেয়েছেন তারই প্রকাশ হয়েছে মার সম্মুখে।

বিনয়কে বিশ্বাস করেন মা সমস্ত অন্তর দিয়ে। তাঁর মনে হয় এ ছেলে যেন স্বর্গলোক হতে নেমে এসেছে, একে ধরে রাখা যাবে কি? এই ব্যাকুলতাই তাঁর অন্তরে মাঝে মাঝে পুঞ্জীভূত করে তোলে উদ্বেগের বাষ্প।

পিতা রেবতীবাবুকে ঢাকা থেকে অন্যত্র চলে যেতে হলো চাকরীর জন্য। ঢাকার বাসা তুলে দিতে হলো। বিনয় এবার উঠে এলেন আরমানিটোলা মেডিকেল ছাত্রাবাসে।

ছাত্রাবাসে এসে বিনয় অল্পদিনেই সবার হয়ে উঠলেন অত্যন্ত প্রিয়; তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এখানে ছড়িয়ে পড়লো সবার উপর। ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক যোগসূত্র স্থাপিত হলো। বেশী কথা তিনি কোনদিনই বলেন না। কিন্তু যখনই কথা বলেন তখনই সবাইকে কান পেতে শুনতে হয়--কথায় যেন যাদু লুকিয়ে থাকে। মেসের নিয়মকানুনকে স্বীকার করা তাঁর স্বভাব নয়। নিয়মের বন্ধনকেই অতিক্রম করে চলেন। কিন্তু নিয়ম-দ্রোহিতাও যেন মেসের বন্ধুদের ভালই লাগে। গভীর রাত্রে মেসে ফিরে এলেও কারো মনে সন্দেহ হয় না।

কি করে সন্দেহ হবে? যাকে ভালোবাসা যায়, তার সব কিছুই ভাল লাগে। বিনয় সবার অন্তর জয় করেন ভালবেসে। তাই তাঁর চলার-পথকে কেউ সন্দেহ করেনি।

নিয়ম যেখানে সত্যের পথে মুক্তির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, সে নিয়মকে ভেঙে সত্যের পথ মুক্ত করতে হয়। যে নিয়ম সত্যকে করে অস্বীকার, মানুষের অন্তরের বাণীকে করে পঙ্গু, সে নিয়মের বন্ধনকে অস্বীকার করাই তো বিপ্লবীর ধর্ম। তাই বিনয় কেবলই নিয়মকে অতিক্রম করে চলেন। কিন্তু দলের নিয়ম মেনে চলার নিষ্ঠাই তাঁকে সত্যের সন্ধান দেয়!

এই সময় বিনয় টেনিস খেলায় মেতে উঠলেন। রোজ বিকালে

তাঁর হাতে দেখা যেত টেনিস র‍্যাকেট। ভালো খেলোয়াড় বলে পরিচিত হলেন ঢাকা সহরে। হাসপালের মেট্রন বিনয়ের সঙ্গে টেনিস খেলার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। মেট্রনের সঙ্গে নিয়মিত সুরু হলো টেনিস খেলা।

হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স, মেট্রন সবাই বিনয়কে ভালবাসে। সবার গৃহের দ্বার তাঁর জন্য উন্মুক্ত। এমনি করে বিনয় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন সর্বত্র। বিনয় সর্বজনপ্রিয়।

তিন

১৯২৮ সন।

সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে গড়ে উঠলো 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স।' পূর্ণ-সামরিক পোষাক পরিহিত এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করলো জি-ও-সি সুভাষচন্দ্রের নির্দেশে। নিখুঁত সামরিক শিক্ষার মাধ্যমে এক শক্তিশালী দল দেশবাসীর বিস্ময় সঞ্চার করলো। যুব বাংলার বুকে এক সামরিক শিক্ষার উন্মাদনা দেখা দিলো। দিকে দিকে কুচ-কাওয়াজ ; সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে এই শিক্ষার প্রভাব। দলে দলে দেশের যুবকগণ 'বি-ভি'তে যোগদান করতে লাগলো। সহর ও গ্রাম মুখরিত হয়ে উঠলো—লেফট, রাইট, লেফট।

নিয়মের বন্ধনে যুবশক্তি নিয়ন্ত্রিত হলো। সমাজে দেখা দিলো শৃঙ্খলাবোধ। দেশের যুবশক্তির প্রাণধারা প্রবাহিত হলো আদর্শের পথে। ভারতের সমাজ জীবনে, জাতির জীবনে যে ভাবধারা ফল্গুধারার মত বয়ে চলেছে তারি সন্ধান পেল জাতি। ফিরে এলো রক্তের সজীবতা।

বিভিন্ন বিপ্লবী দলগুলোর হলো মিলন। এই মিলিত বাহিনীর নেতৃত্ব করলেন সুভাষচন্দ্র। তাঁর নেতৃত্বে গড়ে উঠলো এক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগঠন। আত্মাহুতি দেবার সঙ্কল্প নিয়ে বাহিনীর সৈনিকগণ কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সুরু হলো বিপ্লবীদের নূতন অধ্যায়। ভারতের

স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা এক নূতন নেতৃত্বে সংগঠিত হলো।

ঢাকা সহরেও সুরু হলো কুচকাওয়াজ। মাঠে-ময়দানে সহরের যুবকদের ভীড়। বিনয়ের বাহিনী হলো প্রস্তুত। পূর্ণ-সামরিক পোষাকে এই বাহিনীর নেতৃত্ব করলেন তিনি।

নিখুঁত সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত বিনয়। তাঁর বাহিনী রুট-মার্চ করে চলে—লেফট, রাইট, লেফট। বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে সহরবাসী।

সারা বাংলা দেশে জেগে উঠলো এক অপূর্ব সামরিক চৈতন্য, পাড়ায় পাড়ায় শিশুদের এক নূতন খেলা—লেফট, রাইট।

চার

১৯৩০ সন।

বাংলার ইতিহাসের এই বৎসরটি চির-স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বৃটিশ সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাংলার বিপ্লবীগণ আবার রুখে দাঁড়ালেন। দিকে দিকে দমন-নীতির জবাব দেবার প্রস্তুতি চলতে থাকলো।

১২ই মার্চ গান্ধীজী ডাণ্ডি অভিমুখে অভিযান চালালেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে আহ্বান এলো। সংগ্রামের ডাক। সমস্ত দেশময় ছড়ালো এক অপূর্ব ভাবদীপ্তি। অহিংস আন্দোলন—সত্যাগ্রহ—অবরোধ—বিদেশী বর্জন—লবণ আইন অমান্য।

চট্টগ্রামে বিপ্লবী নেতা সূর্য সেনের নেতৃত্বে গঠিত হলো সামরিক বাহিনী। গঠিত হলো পূর্ণ সামরিক কায়দায়। তাঁর রিপাবলিক্যান বাহিনীতে দলে দলে যোগদান করলো বাংলার তরুণ-তরুণী। স্বেচ্ছাসেবকদের সামরিক কুচ্-কাওয়াজ, বুটের খটাখট্ আওয়াজে মুখরিত হলো আকাশ বাতাস।

হ্যাঁ, এই প্রস্তুতির জন্য চাই অর্থ। প্রচুর অর্থ প্রয়োজন সংগঠনের

কাজে। কিন্তু কোথায় মিলবে টাকা? গুপ্ত কাজে অর্থ আসে গোপন পথেই। সেই পথের সন্ধান পাওয়া ভার।

কর্মী ঢেলে দিলেন তাঁদের সঞ্চিত অর্থ নেতার হাতে। জীবন যেখানে পণ সেখানে অর্থ তুচ্ছ। তাঁদের এই বিপ্লবের প্রভাব থেকে নারীসমাজও মুক্ত নয়। বিরাট স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁরাও এগিয়ে এলেন পুরুষের পাশে। দলের কাছে অলঙ্কারের বোঝা নামিয়ে দিয়ে হলেন তাঁরা ভারমুক্ত।

ঐতিহাসিক ১৮ই এপ্রিল। এই দিনই ইতিহাসের পাতায় আইরিস প্রজাতন্ত্র বাহিনীর বিদ্রোহের দিন বলে লেখা রয়েছে। তাই চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের সংগ্রামের দিন ধার্য্য হলো ১৮ই এপ্রিল, গুড ফ্রাইডে।

চট্টগ্রাম সহরের বাইরে একটি পাহাড়ের ওপর প্রথম রিজার্ভার পুলিশের ঘাঁটি অবস্থিত। রাত্রির নিস্তব্ধতায় আক্রমণ করা হলো ঘাঁটিটি। অনন্ত সিং দলের নেতা। সামরিক কায়দায় অস্ত্রাগারটি ভেঙে ফেলা হলো। তারপর বিপ্লবীদের একান্ত কাম্য বিভিন্ন অস্ত্রসস্ত্র সংগ্রহ করা হলো।

অপরদিকে সহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে বিপ্লবীদের রিভলবার গর্জে উঠলো। Auxiliary force এর Head quarter-এ আক্রমণ চলেছে। বিপ্লবী নেতা লোকনাথ বলের আদেশে অগ্নিনালিকা গর্জে গর্জে উঠছে। পাহাড়ে পাহাড়ে হচ্ছে প্রতিধ্বনিত। দূর হতে দূরে গুলীর আওয়াজ জানিয়ে দিচ্ছে সংগ্রামের বার্ত্তা।

বৃটিশ সিংহ পালালো প্রাণ ভয়ে। চট্টগ্রামের ইংরাজদের স্থান হলো নদীবক্ষে। সহরের বৈপ্লবিক কার্য্যকলাপে ভীত তারা। আহার নিদ্রা ঘুচেছে তাদের। বৃটিশ-সিংহের আর নেই সিংহ বিক্রম।

আগুন লেগেছে সারা দেশময়—বিপ্লবের আগুন। দিকে দিকে শুরু হলো সংগ্রাম। সুরু হলো মুক্তির জয়যাত্রা। রক্তে লেগেছে মুক্তির পরশ।

দিকে দিকে বিপ্লবীদের রিভলবার গর্জে উঠছে। চলছে অত্যাচারের প্রতিবাদ। বয়ে যাচ্ছে রক্তগঙ্গা।

জেগেছে জনতা। দীর্ঘদিনের ঘুম ভেঙেছে। জনমতের বিচারের দিন এসে গেছে। জনগণের কণ্ঠে মুক্তির ধ্বনি। বন্দেমাতরম্ সবার মূলমন্ত্র। বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে কেঁপে উঠছে আকাশ বাতাস।

মেদিনীপুর! মেদিনীপুরে চলেছে বিলাতী বর্জন আন্দোলন। হাটে বাজারে অগ্নিদগ্ধ হচ্ছে স্তূপীকৃত বস্ত্র। স্বেচ্ছাসেবকদের সতর্ক দৃষ্টি চারদিকে। এগিয়ে এলো ছাত্র। এগিয়ে এলো যুবক। এসেছে জাতির প্রাণ কৃষাণকুল।

দাসপুর থানার চেটুয়া গ্রামে বিরাট হাট। স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রস্তুত। এই হাটে বিলাতী কাপড় বিক্রী বন্ধ করা তাঁদের কাজ। থানার দারোগার কাছে এ খবর পৌঁছে যায়। দারোগাও তাঁর পুলিশবাহিনী নিয়ে তৈরী।

৩রা জুন দারোগা ভোলানাথ এলেন হাটে তাঁর বাহিনী নিয়ে। স্বেচ্ছাসেবকগণ তাঁদের পবিত্র কাজে নিয়োজিত। চারজন নেতৃস্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হলেন দারোগার হাতে।

অকস্মাৎ গর্জে উঠলেন দারোগা ভোলানাথ। স্বেচ্ছাসেবক শীতল ভট্টাচার্য্য বসে আছেন দারোগার সঙ্গে একই আসনে। এই দৃশ্য দেখে ক্রোধে আত্মহারা হলেন দারোগা। একজন সামান্য স্বেচ্ছাসেবকের এই আচরণ তাঁর কাছে অসহ্য। এ যে সীমাহীন সাহস, এ যে স্পর্দ্ধা।

দারোগার কণ্ঠ হতে ধ্বনিত হলো অজস্র গালাগাল। তারপর ভট্টাচার্য্যের ওপর সুরু হলো নির্মম বেত্রাঘাত। দারোগার নির্মম আক্রমণে স্বেচ্ছাসেবকের দেহ হলো ক্ষত বিক্ষত। তাঁর আর্তনাদে কেঁপে উঠলো আকাশ বাতাস।

এই দৃশ্য দেখে পাগল হলো জনতা। তাদের অন্তরে জাগলো এক প্রতিহিংসার ভাব। মুহূর্তে সংঘবদ্ধ হলো জনতা। ঝাঁপিয়ে পড়লো পুলিশ বাহিনীর উপর।

এবার জনতার হাতে বন্দী হলেন দারোগা। বন্দী হলেন তাঁর সহকারী অনুচর। তারপর সুরু হলো প্রহার। প্রহারে প্রহারেই হলো তাঁর মৃত্যু। জনতার বিচারে হলো প্রাণদণ্ড।

সংবাদ পৌঁছে গেল মহকুমা হাকিমের কাছে। মহকুমা হাকিম পুলিশ বাহিনী নিয়ে এলেন ঘটনাস্থলে। সেদিন ছিল ৭ই জুন, ১৯২০ সন।

তদন্ত করতে এসেছেন হাকিম ফজল করিম। কিন্তু তদন্ত করা সহজ নয়। জাগ্রত জনতা দৃঢ় অভিমত জানালো 'তদন্ত করা চলবে না।' কে করবে তদন্ত? ইংরাজের গোলাম মহকুমা হাকিম? ইংরাজের অধিকার নেই তদন্ত করার।

কংসাবতী নদীর তীরে সমবেত জনতা! তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে 'বন্দেমাতরম্'।

সমবেত কণ্ঠের বন্দেমাতরম্ ধ্বনি হাকিমের কর্ণে প্রবেশ করতেই তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। গুলীর ভয় দেখালেন জনতাকে। কিন্তু কোথায় ভয়! মৃত্যু ভয়ে ভীত নয় জাগ্রত জনতা।

গুলীর অদেশ দিলেন হাকিম। মুহূর্তে গর্জে উঠলো পুলিশের বন্দুক। নিরস্ত্র জনতার ওপর চললো গুলীবৃষ্টি। শহীদের রক্তে রাঙ্গা হলো কংসাবতীর জল। ঘটনাস্থলে চৌদ্দজনের হলো মৃত্যু। স্বাধীনতা সংগ্রামের চৌদ্দজন শহীদের রক্তে কংসাবতীর তীর হলো ধন্য। ধন্য হলো মেদিনীপুর। ধন্য হলো বাংলা। উজ্জ্বল হলো ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস।

মেদিনীপুর জেলে আবদ্ধ মেজর সত্যভূষণ গুপ্ত। দলের গোপন প্রস্তুতির খবর তাঁর কাছে পৌঁছে গেল। দলের প্রতিটি খবরের জন্য তিনি উন্মুখ হয়ে থাকতেন। কিন্তু কিছুদিন হলো তিনি বাহিরের খবর হতে বঞ্চিত। তাই অধীর আগ্রহে বসে ছিলেন খবরের আশায়।

অন্ধকার সেলে বন্দী গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। সূর্য্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। বাগানের কর্মরত কয়েদীরা ফিরে আসছে জেলের

দিকে দিকে বিপ্লবীদের রিভলবার গর্জে উঠছে। চলছে অত্যাচারের প্রতিবাদ। বয়ে যাচ্ছে রক্তগঙ্গা।

জেগেছে জনতা। দীর্ঘদিনের ঘুম ভেঙেছে। জনমতের বিচারের দিন এসে গেছে। জনগণের কণ্ঠে মুক্তির ধ্বনি। বন্দেমাতরম্ সবার মূলমন্ত্র। বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে কেঁপে উঠছে আকাশ বাতাস।

মেদিনীপুর! মেদিনীপুরে চলেছে বিলাতী বর্জন আন্দোলন। হাটে বাজারে অগ্নিদগ্ধ হচ্ছে স্তূপীকৃত বস্ত্র। স্বেচ্ছাসেবকদের সতর্ক দৃষ্টি চারদিকে। এগিয়ে এলো ছাত্র। এগিয়ে এলো যুবক। এসেছে জাতির প্রাণ কৃষাণকুল।

দাসপুর থানার চেটুয়া গ্রামে বিরাট হাট। স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রস্তুত। এই হাটে বিলাতী কাপড় বিক্রী বন্ধ করা তাঁদের কাজ। থানার দারোগার কাছে এ খবর পৌঁছে যায়। দারোগাও তাঁর পুলিশবাহিনী নিয়ে তৈরী।

৩রা জুন দারোগা ভোলানাথ এলেন হাটে তাঁর বাহিনী নিয়ে। স্বেচ্ছাসেবকগণ তাঁদের পবিত্র কাজে নিয়োজিত। চারজন নেতৃস্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হলেন দারোগার হাতে।

অকস্মাৎ গর্জে উঠলেন দারোগা ভোলানাথ। স্বেচ্ছাসেবক শীতল ভট্টাচার্য্য বসে আছেন দারোগার সঙ্গে একই আসনে। এই দৃশ্য দেখে ক্রোধে আত্মহারা হলেন দারোগা। একজন সামান্য স্বেচ্ছা-সেবকের এই আচরণ তাঁর কাছে অসহ্য। এ যে সীমাহীন সাহস, এ যে স্পর্দ্ধা।

দারোগার কণ্ঠ হতে ধ্বনিত হলো অজস্র গালাগাল। তারপর ভট্টাচার্য্যের ওপর সুরু হলো নির্মম বেত্রাঘাত। দারোগার নির্মম আক্রমণে স্বেচ্ছাসেবকের দেহ হলো ক্ষত বিক্ষত। তাঁর আর্তনাদে কেঁপে উঠলো আকাশ বাতাস।

এই দৃশ্য দেখে পাগল হলো জনতা। তাদের অন্তরে জাগলো এক প্রতিহিংসার ভাব। মুহূর্তে সংঘবদ্ধ হলো জনতা। ঝাঁপিয়ে পড়লো পুলিশ বাহিনীর উপর।

এবার জনতার হাতে বন্দী হলেন দারোগা। বন্দী হলেন তাঁর সহকারী অনুচর। তারপর সুরু হলো প্রহার। প্রহারে প্রহারেই হলো তাঁর মৃত্যু। জনতার বিচারে হলো প্রাণদণ্ড।

সংবাদ পৌঁছে গেল মহকুমা হাকিমের কাছে। মহকুমা হাকিম পুলিশ বাহিনী নিয়ে এলেন ঘটনাস্থলে। সেদিন ছিল ৭ই জুন, ১৯২০ সন।

তদন্ত করতে এসেছেন হাকিম ফজল করিম। কিন্তু তদন্ত করা সহজ নয়। জাগ্রত জনতা দৃঢ় অভিমত জানালো 'তদন্ত করা চলবে না।' কে করবে তদন্ত? ইংরাজের গোলাম মহকুমা হাকিম? ইংরাজের অধিকার নেই তদন্ত করার।

কংসাবতী নদীর তীরে সমবেত জনতা! তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে 'বন্দেমাতরম্'।

সমবেত কণ্ঠের বন্দেমাতরম্ ধ্বনি হাকিমের কর্ণে প্রবেশ করতেই তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। গুলীর ভয় দেখালেন জনতাকে। কিন্তু কোথায় ভয়! মৃত্যু ভয়ে ভীত নয় জাগ্রত জনতা।

গুলীর অদেশ দিলেন হাকিম। মুহূর্তে গর্জে উঠলো পুলিশের বন্দুক। নিরস্ত্র জনতার ওপর চললো গুলীবৃষ্টি। শহীদের রক্তে রাঙ্গা হলো কংসাবতীর জল। ঘটনাস্থলে চৌদ্দজনের হলো মৃত্যু। স্বাধীনতা সংগ্রামের চৌদ্দজন শহীদের রক্তে কংসাবতীর তীর হলো ধন্য। ধন্য হলো মেদিনীপুর। ধন্য হলো বাংলা। উজ্জ্বল হলো ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস।

মেদিনীপুর জেলে আবদ্ধ মেজর সত্যভূষণ গুপ্ত। দলের গোপন প্রস্তুতির খবর তাঁর কাছে পৌঁছে গেল। দলের প্রতিটি খবরের জন্য তিনি উন্মুখ হয়ে থাকতেন। কিন্তু কিছুদিন হলো তিনি বাহিরের খবর হতে বঞ্চিত। তাই অধীর আগ্রহে বসে ছিলেন খবরের আশায়।

অন্ধকার সেলে বন্দী গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। সূর্য্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। বাগানের কর্মরত কয়েদীরা ফিরে আসছে জেলের

ভেতর। পায়ে পায়ে লোহার শিকলের আওয়াজ। বন্দীর মন ছুটে চলে কারা-প্রাচীরকে অতিক্রম করে বহুদূরে। ধ্যানমগ্ন সে।

হঠাৎ খট্ খট্ আওয়াজে বন্দীর ধ্যান ভেঙ্গে গেল। খুট করে আওয়াজ করে সেলের গরাদ খুলে গেল। সিপাহী ছোট একটি কাগজ বন্দীর হাতে তুলে দিল। কাগজটার দিকে তাকাতেই বন্দীর মনে খুশীর দোলা লাগলো। অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করলেন—ইন্টারভিউ।

ইন্টারভিউ রুমে বসেছিলেন বিপ্লবী নেতা 'বেণু' সম্পাদক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়। তাঁরই পাশে গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টর বসে আছেন।

ইন্টারভিউ রুমের দরজা খুলে গেল। ভেতরে প্রবেশ করলেন সত্য গুপ্ত। ভূপেনবাবুর সঙ্গে বন্দীর নানা কথা চলতে থাকে—হাসি গল্পের কথা। গোয়েন্দা তার কান দুটি সজাগ করে রেখেছে। কিন্তু গোয়েন্দার সমস্ত সতর্কতা ব্যর্থ করে দিয়ে ভূপেনবাবু বন্দীকে অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন—'আয়োজন আমাদের সম্পূর্ণ, এই মাসেই ঢাকায় 'এ্যাক্শন' হবে।'

ফিরে এলেন বন্দী তাঁর নির্দিষ্ট সেলে।

দীর্ঘ দিনের বিপ্লবের আয়োজন হ'তে চলেছে সমাপ্ত। দীর্ঘ দিনের সাধনার ফল নিশ্চয়ই শুভ হয়ে ঝরে পড়বে দেশের বুকে। নবসৃষ্টির জন্য যে ধ্বংসের আয়োজন তা স্বীকার করে নিয়েছে বিপ্লবী বাংলা। সেই ধ্বংস যজ্ঞে আহূতি দেবে বিপ্লবীদের জীবন। স্বেচ্ছায় আত্মত্যাগের মহামন্ত্র ছড়িয়ে পড়বে বিশ্বময়।

যুগ যুগ ধরে পরপদানত দেশসমূহের দেশপ্রেমিকগণ এই আত্মাহুতি দেবার পথেই এগিয়ে চলে। তাঁদের চলার পথের সমস্ত বাধা দূর হয়ে যায় দেশ-প্রেমের সোনার কাঠির স্পর্শে।

বন্দী জানেন তাঁর দলের প্রস্তুতি অতি নিখুঁত। তাই দলের 'এ্যাকসান' সম্পর্কে তাঁর রয়েছে পূর্ণ বিশ্বাস। দলের কর্মীদের উদ্দেশ্যে জানান শুভেচ্ছা।

২৯শে আগষ্ট। ১৯৩০ সন।

আজই আসবে বাংলার কারাসমূহের ইন্সপেক্টর জেনারেল লোম্যান সাহেব ঢাকা মিট্‌ফোড হাসপাতালে। নারায়ণগঞ্জের জল-পুলিশের সুপার মিঃ এইচ. এস, বার্ট অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে এসেছেন। তাঁকে দেখার জন্য রাজপুরুষদের আনাগোনা।

লোম্যান সাহেবের আগমনের বার্তা বিপ্লবীদের কাছে যথাসময়েই পৌঁছে গেল।

বিনয় আরমানীটোলা ছাত্রাবাসে একটু দেরী করেই আজ ঘুম থেকে উঠলেন। মনে পড়ে গেল দলের নির্দেশ। ঠিক ৯টায় তাঁকে উপস্থিত থাকতে হবে হাসপাতালে।

যথানিয়মে হাত মুখ ধুয়ে জলখাবার শেষ করলেন। দেয়াল থেকে হাফ-সার্টটা টেনে নিয়ে গলিয়ে দিলেন শরীরে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পরিপাটি করে কেশবিন্যাস করে সেণ্ডেল পায় দিলেন।

ওষ্ঠে মৃদু হাসি। মুখে এক স্বর্গীয় ভাব। ললাটে দৃঢ়তার ছাপ। নিকেল করা ছোট্ট ৩২ বোরের পাঁচ-ঘরা রিভলবারটি জামার পকেটে লুকিয়ে নিতে ভুল হলো না তাঁর।

খোলা জানালা দিয়ে সোনালী রোদ এসে ঘর ভরে গেছে। মিঠে হাওয়ার মৃদুস্পর্শ ঘরের ভিতর। সম্মুখের গাছ থেকে পাখীর গান শোনা যাচ্ছে। রাস্তা থেকে ভেসে আসছে শহরের কর্মচঞ্চল কোলাহল।

বিনয় এগিয়ে চললেন দরজার দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে। সিঁড়ি বেয়ে নামবার সময় দেখা হয়ে গেল এক বন্ধুর সঙ্গে।

বন্ধুট উৎসুক নয়নে বিনয়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় চলেছ ভাই?' চলতে চলতে জবাব দিলেন বিনয়, 'তোমার জন্য রঙ্গীন বেলুন আনতে।'

বিনয় একটু দ্রুত এগিয়ে চললেন। ঠিক ন'টায় যে তাঁকে উপস্থিত

হতেই হবে। তাঁর চলার ছন্দে কোন জড়তা নেই। সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে এগিয়ে চললেন হাসপাতালের রাস্তায়। চারদিকে একবার সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন।

চলতে চলতেই বুঝতে পারলেন লোম্যান সাহেব সদলবলে এসে গেছেন। চারদিকে গোয়েন্দা পুলিশের অবস্থিতি। এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে অপরিচিত মুখ। পোশাকপরা পুলিশদলও নানাস্থানে দাঁড়িয়ে তাদের কর্তাদের রক্ষা করার পবিত্র কাজে নিয়োজিত। চারদিকে একটা থমথমে ভাব।

বিনয় আরো সতর্ক হয়ে এগিয়ে চললেন।

চেহারার বৈশিষ্ট্য ও সহজ চলার ছন্দে গোয়েন্দাদের মনে কোন সন্দেহ স্থান পেল না! এমন সুন্দর মিষ্টি চেহারার যুবককে সন্দেহ করা যায় কি? তাছাড়া মেডিক্যাল স্কুলের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রকে যাতায়াতে বাধা দেবারও কথা নয়।

বিনয় এগিয়ে এলেন হাসপাতালের সম্মুখে। অল্প দূরে হাসপাতালের বারান্দায় দাঁড়িয়ে লোম্যান ও হডসন। তাঁদেরই পাশে দাঁড়িয়ে গভর্ণমেন্ট কণ্ট্রাক্টার সত্যেন সেন।

গল্পে মশগুল রাজপুরুষগণ। তাঁদের মনে খুশীর হাওয়া। সরকারের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। কাজেই ভাবনা আর কী? মৃত্যু পুলিশ ও গোয়েন্দা বেষ্টনী ভেদ করে আসতে পারবে কী?

কিন্তু ঐ যে মাত্র বিশ হাত দূরে বাংলার বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ বিনয় বসু দাঁড়িয়ে আছেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বুকে দুর্দান্ত আঘাত হানার জন্য তা রাজপুরুষদের দৃষ্টিপথে আসেনি।

বিনয় তাঁর জামার পকেট থেকে দৃঢ় হস্তে ছোট রিভলবারটি বার করলেন। উজ্জ্বল রোদে চক্‌চক্ করে উঠলো নিকেল করা রিভালবারটি। মুহূর্তে নিশানা ঠিক হয়ে গেল। পরপর তিনটি গুলী গর্জে গিয়ে লোম্যানের দেহে হলো বিদ্ধ। লোম্যান আর্তনাদ করে ধূলায় লুটিয়ে পড়লেন।

বিনয়ের রিভলবারের নিশানা অভ্রান্ত।

গুলীর আওয়াজে হতবুদ্ধি হডসন বিনয়ের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই আবার রিভলবার গর্জে উঠলো ঢাকার পুলিশ সুপার হডসনকে লক্ষ্য করে। পর পর দুটো গুলী খেয়ে বিরাট দেহী হডসন বিকট চীৎকার করে ধরাশায়ী হলেন মহীরুহের মতো।

একি, কোথা হতে এল এই কালনাগিনী লখীন্দরের লোহার ঘরে? কোন্ পথে এর প্রবেশ? পুলিশের সতর্কতার জাল ছিন্ন করে কোথা থেকে এল এই চতুরতম যাদুকর।

পুলিশ, গোয়েন্দা ও অন্যান্য সকলে মুহূর্তের জন্য সম্বিত হারিয়ে ফেললো।

পাঁচটি গুলীই শেষ, গুলী ভরে নেবারও সময় নেই। বিনয় মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে থেকে চোখ বুলিয়ে নিলেন চারদিকে। তাঁকে গ্রেপ্তার হলে তো চলবে না। এখনই এই স্থান ত্যাগ করতে হবে সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে।

সরকারী কনট্রাক্টার সত্যেন সেন মিটমিট করে তাকিয়েছিল বিনয়ের দিকে। তার মনে ভবিষ্যতের আশা জাগে। এই যুবককে গ্রেপ্তার করতে পারলে ভবিষ্যতের ভাবনা তার ঘুচে যায়। ইংরাজের করুণা ঝরে পড়বে সহস্রধারে তার ওপর।

বুঝতে পারে বিনয়ের রিভলবারের গুলী ফুরিয়ে গেছে। হঠাৎ মরিয়া হয়ে জাপটে ধরলো বিনয়কে। কিন্তু জানা ছিল না ইংরাজের গোলাম সত্যেন সেনের যে বিনয়কে গ্রেপ্তার করা তার সাধ্যাতীত।

কুস্তির এক প্যাঁচ দিয়ে বিনয় নিজেকে মুক্ত করে নিলেন তারপর ওর নাকের ওপর এক বিরাট ঘুসি বসিয়ে ছুটে চললেন বাইরের দিকে।

এতক্ষণে সবার সম্বিত ফিরে এলো, বুঝতে পারলো ঘটনার গুরুত্ব। একযোগে সবাই পশ্চাদ্ধাবন করলো বিনয়ের। সম্মুখেও লোকের ভীড়। তারা বুঝতে পারে না বিনয়কে কেন গ্রেপ্তার করতে হবে। কি করেছে সে?

হাসপাতাল ও মেডিক্যাল স্কুলের মধ্যেকার রাস্তার দিকে ছুটে চললেন তিনি। দারোয়ান ও কয়েকজন কুলি এগিয়ে এলো তাঁকে গ্রেপ্তার করতে। কিন্তু ওদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হলো।

স্কুলের খোলা মাঠে এসে পড়লেন বিনয়। মুহূর্তকাল থমকে দাঁড়ালেন। আবার একদল দারোয়ান ছুটে আসছে। কি করা যায়? পিস্তল তো ফেলে এসেছেন হাসপাতালে। এতগুলো লোককে ফাঁকি দেবেন কি ভাবে? হঠাৎ নিজের হাতখানা রিভলবারের আকারে তুলে ধরলেন। ভীত দারোয়ানগণ ছুটে পালালো উল্টোদিকে রিভলবার মনে করে। সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে এগিয়ে চললেন তিনি। ডিসেক্‌শন রুমের পিছনকার দেওয়াল টপকে একেবারে মেডিক্যাল মেসের সামনে এসে পড়লেন। মুহূর্তকাল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কর্তব্য স্থির করে নিলেন। দৌড়ে পায়খানার ছাদে উঠলেন। সেখান থেকে পাশের এক অপরিচিত বাড়ীতে। বাড়ীর খোলা দরজা দিয়ে ছুটে এলেন আরমানীটোলা ময়দানে। উন্মুক্ত জনমানবহীন মাঠে অনেকটা নিরাপদ মনে হলো। কপালের ঘাম মুছে ফেলে ধীরে ধীরে একান্ত সহজভাবে এগিয়ে চললেন রাস্তার দিকে। তারপর উঠে বসলেন ঘোড়ার গাড়ীতে। দ্রুত ছুটে চললো গাড়ী।

গাড়ী দীর্ঘ রাস্তা অতিক্রম করে এসে দাঁড়ালো বক্সীবাজারে একটি বাড়ীর সম্মুখে। বিনয় দ্রুত বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলেন।

এ বাড়ীটি পার্টি'র সভ্য মণি সেনের বাড়ী। বন্ধুকে এ-অবস্থায় পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন বাড়ীর মালিক। পুলিশের চক্ষুকে আড়াল করে রাখার বন্দোবস্ত হয়ে গেল। বিনয় নিরাপদে ফিরে এসেছেন এই সুসংবাদটি পৌঁছে গেল পার্টি'র আর একটি সভ্যের কাছে। তিনি আর কেউ নন, সুপতি রায়।

ছয়

ভয়ের ভাব কাটতেই রাজপুরুষগণ তৎপর হয়ে উঠলো। পুলিশ ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে টেলিফোন বেজে উঠলো ক্রিং ক্রিং। শহরের এক

প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে উত্তেজনার স্রোত। সরকারের সামরিক গাড়ী টহল দিচ্ছে রাস্তায়। রেল ও ষ্টীমার ষ্টেশনে গোয়েন্দা ও ইউনিফর্ম-পরা পুলিশের ভীড়। ট্রেনের কামরা থেকে টেনে টেনে লোক নামিয়ে তল্লাস সুরু হলো। ষ্টীমারের যাত্রীদের ওপর সামরিক হামলা। পথচারীদের ওপর বর্বর অত্যাচার।

সহরবাসী অত্যাচারের ভয়ে ভীত হয়ে গৃহকোণে আশ্রয় নেয়। কিন্তু তবু রক্ষা নেই পুলিশের হাত থেকে। বাড়ী বাড়ী চললো তল্লাসী।

কিন্তু কোথায় সে যুবক? কে সে যুবক? পুলিশ তার পরিচয় জানে না। ব্যর্থতার জ্বালায় জ্বলে যায় অন্তর।

পুলিশের তৎপরতায় অবশেষে আততায়ীর নাম তারা জানতে পারলো! বিনয়ের পরিচিত এক যুবক বিনয়কে গুলী ছুঁড়তে দেখেছিল। তারই কাছ থেকে পুলিশ বিনয়ের পরিচয় পেয়ে যায়।

খেলোয়াড়ী বিনয়ের ফটো আবিষ্কার হয় মেডিক্যাল স্কুলের ট্রফি-বিজয়ীদের গ্রুপ ফটোর মধ্যে।

এবার পৈশাচিক আনন্দে নৃত্য করে অত্যাচারী পুলিশ। বিনয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে এমন কিছু আবিষ্কার করতে পারলে তারই উপয় ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিশ দল। তারা স্থির করে, এমন অত্যাচার চালাবে যে অত্যাচারের ভয়ে ভীত হয়ে বাংলার বিপ্লবীগণ, বাংলার জনগণ আত্মসমর্পণ করবে ইংরাজ সরকারের কাছে।

নারায়ণগঞ্জ থেকে ডেকে আনা হলো য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবকদের। লালমুখো সার্জেণ্ট ও ভেজাল সাহেব যুবকদের মিলিত অভিযান চলে আরমানীটোলা মেডিক্যাল ছাত্রাবাসে।

বিনয় ছিলেন এই ছাত্রাবাসে। তাই প্রতিহিংসায় হিংস্র হয়ে ওঠে ইংরাজ রাজপুরুষগণ। নির্মম অত্যাচার চলে ছাত্রাবাসে। সার্জেণ্টের বুটের লাথিতে মুখ থুবড়ে পড়ে ছাত্রগণ। দোতলা থেকে লাথি মেরে ফেলে দেয় মাটিতে। এক তাণ্ডব নৃত্য চলে মেসের গৃহে গৃহে। সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যায়। ছাত্রদের আঘাত-জর্জর শরীর

যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করে। আর্তনাদ ভেসে আসে বাতাসের বুকে। সম্মুখের গাছ থেকে পাখীরা আর্তনাদ করে পালিয়ে যায়।

এই অত্যাচারের খবর ছড়িয়ে যায় ঢাকা সহরের গৃহে গৃহে। শহরবাসীর মনে জাগে প্রতিহিংসার ভাব। তারা সমস্ত অন্তরের শুভেচ্ছা জানায় বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে।

সারা ভারতের গোয়েন্দা বিভাগ তৎপর হয়ে ওঠে। দিকে দিকে তাদের লোক ছড়িয়ে যায়। সন্ধান চলে সর্বত্র!

আরাকানের পথে, ইম্ফল প্রান্তরে সর্বত্র গোয়েন্দা ঘুরে বেড়ায়। তাদের সন্দেহ, হয়তো আরাকানের পথে কিম্বা ইম্ফলের হাঁটা পথে পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করে চলে যাবে বাংলার বিপ্লবী দূর দেশে। তাই সমস্ত রাস্তা তারা বন্ধ করে রাখলো।

কোলকাতার রাস্তায় রাস্তায় চলে আলোচনা। ট্রামে-বাসে শুধু একই প্রশ্ন আলোচিত হয়। ঢাকার বিপ্লবীদের অপূর্ব বীরত্বের কথা সবার মনে এনে দেয় মুক্তির পরশ।

যুব-বাংলার রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। মুক্তিপাগল বাঙ্গালীর বক্ষ রক্তে অতীতের বীরত্বের গরিমা জাগে। রক্তের সজীবতা ফিরে আসে শিরায় শিরায়। আসন্ন মুক্তির আনন্দে হয় মাতাল। ঘুমন্ত জাত হঠাৎ জেগে ওঠে। মুক্তির লেখা, লেখা হয় ঊর্ধ্ব গগনে। অপূর্ব ভাবদোলায় বাংলার যুবসমাজ দুলতে থাকে।

যা ছিল সুপ্ত তারই প্রকাশ বিপ্লবী কার্যকলাপে সবার অন্তরে। জাতির সমবেত সাধনার মূর্ত প্রতীক এই বিপ্লবীগণ।

সাধ্য কি বিনয়কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ! মৃত্যুর সঙ্গে যাঁর মিতালি তাঁকে কে গ্রেপ্তার করবে? গ্রেপ্তার হবার পূর্বে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিতে দ্বিধা করবে না সে।

হাজারে হাজারে বিনয়ের ছবি ছড়িয়ে পড়লো সারা দেশময়। গোয়েন্দা পুলিশ দল বেঁধে ঘুরে বেড়াতে লাগলো ফটো সঙ্গে নিয়ে। সুন্দর যুবক দেখলেই অলক্ষ্যে ফটোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে লাগলো —এই কি বিনয়?

পুরস্কার ঘোষণা করা হলো দশ হাজার টাকা।

বিনয়কে গ্রেপ্তার করার জন্য টাকার প্রলোভন দেখানো হয় দেশবাসীকে। কিন্তু দেশবাসীর তরফ থেকে অদৌ উৎসাহ বা আগ্রহ দেখা গেল না এই প্রলোভনের প্রতি।

নারী সমাজ চঞ্চল হয়ে উঠলো। তাঁদের মাতৃ-হৃদয়ের সমস্ত ব্যাকুলতা রক্ষা করতে চায় বিনয়কে। বিনয় যেন তাঁদেরই ছেলে—সারা বাংলার ছেলে।

গ্রামের বধূ সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালিয়ে ঠাকুরের কাছে জানালো মিনতি, বিনয়ের মঙ্গল কামনা করে।

৩রা সেপ্টেম্বর বিনয়ের রূপের বর্ণনা করে সরকারের বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়—'বয়স ২২ বৎসর, Fair complexion, short stature, round face, pointed nose, normal eyes, hair black, ordinary cut'.

সাত

বিনয় বক্সীবাজারে বন্ধুর বাড়ী সারাদিন অবস্থান করলেন। রাস্তার মোড়ে দলের কর্মীদের সতর্ক পাহারা। অচেনা মুখ ঢুকতে দেখলেই মুহূর্তে খবর পৌঁছে যায়।

বিনয় দুপুরে নিশ্চিন্তে ঘুমান। কোনই ভাবনা তাঁর নেই। সমস্ত ভাবনা দলের নেতাদের। বিনয়ের কি? নেতাদের নির্দেশেই তাঁকে চলতে হয়। তাই তিনি নিজের ভাবনার বোঝা চাপিয়ে দেন দলের ওপর।

কর্ম করাই তাঁর আনন্দ। নিঃস্বার্থ কর্মেই মানবের মুক্তি। সেই মুক্তি পথের সন্ধান তাঁর মিলেছে বিপ্লব-মন্ত্রে।

পশ্চিম আকাশের সূর্য ধীরে ধীরে ডুবে গেল। আঁধার নেমে এল ধরণীর বুকে। বিনয় পরিপাটি করে সম্ভ্রান্ত পোষাকে নিজেকে সজ্জিত করলেন। রাত্রির অন্ধকারে রাস্তায় নেমে এলেন। চারদিকে

সতর্ক দৃষ্টি রেখে এগিয়ে চললেন সম্মুখের দিকে। দলের দু'জন কর্মী তাঁকে অনুসরণ করছে। দুজন চলছে সম্মুখে এগিয়ে।

কর্মীদের কোমরে রিভলবার। প্রয়োজনে রিভলবার গর্জে উঠবে। পুলিশের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার এইতো সহজ পন্থা। গুলীর জবাবে গুলী।

অত্যন্ত সতর্ক ব্যবস্থায় কোন বাধা এলো না। অপ্রশস্ত গলিপথে এগিয়ে চললেন বিনয় সতর্ক পদক্ষেপে।

শঙ্করটোলায় অবস্থিত জগন্নাথ কলেজ মেস। সেই মেসবাড়ীর নিভৃত কক্ষে রাত্রির অন্ধকারে আশ্রয় নিলেন তিনি। সুনিদ্রায় রাত্রি কেটে গেল। রাত্রি প্রভাতের পূর্বে আবার এ আশ্রয় ত্যাগ করতে হয়। অন্ধকার পথেই বিপ্লবীদের পথ-চলা।

রাত্রি প্রভাতের পূর্বেই বিনয় নূতন আশ্রয়ের পথে যাত্রা শুরু করলেন। দ্রুত পদে গেণ্ডারিয়া এসে এক বন্ধুর বাড়ীতে ঢুকে পড়লেন। একা পথ চলা তাঁর বন্ধ। তাঁর নিরাপত্তার দিকে দলের একান্ত সতর্ক দৃষ্টি।

ভোর থেকেই আকাশে কালো কালো মেঘের আনাগোনা। সূর্যের সঙ্গে চলেছে লুকোচুরি খেলা। থেকে থেকে দমকা হাওয়ার ঝাপ্টা।

দুপুরের দিকে মেঘগুলো স্থির হয়ে দাঁড়ালো আকাশের বুকে। সূর্য হারিয়ে গেল মেঘের আড়ালে। বাতাসের গতি বৃদ্ধি পেলো। দেখতে দেখতে আকাশের মেঘ জল হয়ে ঝরে পড়লো ধরণীর বুকে। বাতাস আত্মপ্রকাশ করেছে দৈত্য-ঝড় রূপে। ঝড়ের দাপটে গাছের ডালপালা আর্তনাদ করছে। সুরু হলো প্রকৃতির তাণ্ডব নৃত্য। সৃষ্টি বুঝি ধ্বংস হয়ে যাবে!

গেণ্ডারিয়ার বাড়ীতে অপেক্ষা করছিলেন বিনয় ও সুপতি রায়। সন্ধ্যার অন্ধকারে তাঁদের যাত্রা সুরু হবার কথা। যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ।

রাস্তা জনমানব শূন্য। সবাই আশ্রয় নিয়েছে ঘরের কোণে। প্রকৃতির রুদ্র মূর্তি দেখে সবাই ভীত।

বিপ্লবীদের পথ-চলার এইতো উপযুক্ত সময়। প্রকৃতি তার বিপ্লবী সন্তানদের যাত্রাকালে ইচ্ছা করেই যেন ঝড়ের আয়োজন করেছেন।

সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে রাস্তায় নেমে এলেন বিনয় ও সুপতি রায়। ঝড়ের গতি আরো বৃদ্ধি পেলো। প্রবল বর্ষণে রাস্তায় জল জমে' গেল।

বিপ্লবীদ্বয় এগিয়ে চললেন সম্মুখে। তাঁদের চিনবার উপায় নেই। বিনয়ের পরণে গ্রাম্য মুসলমানের পোষাক। পরণে ছেঁড়া লুঙি, গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি, মাথায় নোংরা একটা গামছা জড়ানো। আগে আগে চললেন সুপতি রায়, পেছনে বিনয়। দু'জনার মাথায়ই রয়েছে ছাতা, ঝড়ের প্রবল বাতাস কেবলই ছাতা দু'টোকে উল্টে-পাল্টে দিয়ে যায়। ভিজে যায় সারা অঙ্গ।

বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যই বিপ্লবীদের ছাতার প্রয়োজন নয়। ছাতার আড়ালে মুখ লুকিয়ে রাখা সহজ। তাই সম্পূর্ণভাবে ভিজে গিয়েও তাঁদের ছাতা বন্ধ হচ্ছে না। সারা অঙ্গে লাগছে জলের ঝাপ্‌টা। থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকায়। বাতাসের গতি তাঁদের পথ-চলাকে আরো দুর্গম করে তোলে।

সন্ধ্যা তখনও হয়নি, কিন্তু ঘন মেঘ বর্ষণে আঁধার নেমে আসে পৃথিবীর বুকে। সেই আঁধারের চাদর অঙ্গে জড়িয়ে এগিয়ে চললেন বিপ্লবীদ্বয় ঢাকা সহরের দোলাইগঞ্জ ষ্টেশনের দিকে।

ষ্টেশনের কাছে একটা ভাঙ্গা বাড়ীতে আশ্রয় নিলেন বিনয়। ট্রেনের তখনও দেরী আছে। ষ্টেশনে লোকের ভীড় নেই। দু'চারজন লোক দাঁড়িয়ে আছে ট্রেনের আশায়। সুপতি রায় চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে এগিয়ে চললেন টিকিট ঘরের দিকে। টিকিট করার সময় অকস্মাৎ দেখতে পেলেন ঘরের মধ্যে গোয়েন্দা বিভাগের লোক।

চিন্তিত হয়ে ফিরে এলেন বিনয়ের কাছে। জানালেন গোয়েন্দার অবস্থিতির কথা।

ট্রেন এসে গেল। বিপ্লবীদ্বয় এগিয়ে এলেন প্লাটফর্মে। ছাতা দিয়ে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে রইলেন এক কোণে।

গাড়ী থামতেই পুলিশ ও গোয়েন্দাদল ট্রেনের কামরায় ঢুকে পড়লো তর্ তর্ করে। যাত্রীদের ওপর চললো তাদের অত্যাচার। সুন্দর চেহারার যুবকের সন্ধানে নেকড়ে বাঘের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে গোয়েন্দা পুলিশের ধুরন্ধরেরা।

পেছনকার কামরা কটা তল্লাসী হবার পর পুলিশদল এগিয়ে গেল সম্মুখে।

বিপ্লবীদ্বয় এই সুযোগে টুক্ করে ঢুকে পড়লেন পেছনকার কামরায়। কামরায় এক কোণে মাথা হেঁট করে বসে পড়লেন বিনয়।

কামরায় একদল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। হৈ-হল্লায় কামরা মুখর হয়ে উঠলো। বাইরে তখনও চলছে প্রবল বর্ষণ। ঝড়ো হাওয়া তখনও বন্ধ হয়নি। মাঝে মাঝে আসছে জলের ঝাপ্‌টা জানালার ফাঁক দিয়ে। জল ছড়িয়ে পড়ছে কামরার মধ্যে।

ছাত্রদলেরই ভেতর রয়েছে পার্টির লোক। বিনয়ের যাত্রাপথের সন্ধান তারা রাখে। দলের নির্দেশে তাই প্রস্তুত হয়ে এসেছে তারা। রিভলবার রয়েছে তাদের সঙ্গে। বিপদ এলে পুলিশের হাত থেকে বিনয়কে রক্ষা করার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত তারা।

এগিয়ে চললো গাড়ী নারায়ণগঞ্জের দিকে। যাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য এত প্রচেষ্টা ও এত পরিশ্রম, তিনি কিন্তু নিরাপদেই এসে যান নারায়ণগঞ্জের আগের ষ্টেশন চাষাড়ার ডিষ্টেন্ট্-সিগ্‌নালের কাছে। ছাত্রদলের মধ্যে থেকে একজন এলার্ম-চেন টেনে গাড়ী থামিয়ে দিল।

নেমে পড়লেন বিনয় ও সুপতি রায়। দলের অন্যান্য বন্ধুরাও তাঁদের অনুসরণ করলেন। জল-ঝড় তখনও থামেনি। অন্ধকার আরও গভীরতার রূপ নেয়। মাঠের পথে দ্রুত এগিয়ে চললেন

বিপ্লবীবৃন্দ। মাঠের মাঝখানে তাঁদের গতি মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছে। হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে কাদায়। কাদা ঝেড়ে ফেলে আবার এগিয়ে চললেন তাঁরা শহরের দিকে।

নারায়ণগঞ্জ শহরের এক প্রান্তে এক গোপন গৃহে আশ্রয় নিলেন বিনয়। বন্ধুরা এবার বিদায় নিলেন। এবার পার্টির নারায়ণগঞ্জ শাখা বিনয়ের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। নারায়ণগঞ্জের বিশিষ্ট কর্মীগণ তৎপর হয়ে উঠলেন। পুলিশের গতিবিধির দিকে রাখলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। বিনয়ের আশ্রয়ের চারিদিকে তাঁদের সতর্ক পাহারা।

পুলিশের গুপ্ত খবর যথাসময়ে পৌঁছে গেল গুপ্ত দলের নেতাদের কাছে। নদীতে নৌকোয় তল্লাসী চলবে। ভদ্র যুবকদের ওপর পুলিশের দৃষ্টি।

ইংরাজ ভেদনীতি প্রয়োগ করে মুসলমান সমাজকে তাদের প্রভাবে রাখতে আংশিক সক্ষম হয়েছিল। মুসলমানদের ওপর তাদের ভরসা ছিল। তাই মুসলমান বলে পরিচয় দেওয়াই নিরাপদ মনে করলেন বিপ্লবীদ্বয়।

পরদিন রাত্রি প্রভাতের পূর্বেই মুসলমানের পোষাকে রাস্তায় নেমে পড়লেন বিপ্লবীদ্বয়। নদীর ঘাটে আগেই প্রস্তুত ছিল নৌকা। তখনও রাত্রির নিস্তব্ধতায় ঘুমিয়ে আছে সারা শহর। প্রভাতের আগমনবার্তা গাছে গাছে পাখীদের কাছে কখনও পৌঁছয়নি। আকাশে তখনও প্রভাতী তারা জোনাকির মত মিটমিট করছে।

নৌকায় উঠে বসলেন দু'জন। নদীর বুকে দাগ কেটে এগিয়ে চললো ছোট্ট নৌকাটি। ছোট ছোট ঢেউ এসে ছুঁয়ে যায় নৌকোর তলদেশ। তরঙ্গের অপূর্ব ছন্দে, শেষ রাত্রের নিস্তব্ধতায়, আকাশের স্বপ্নময় দৃশ্যে সৃষ্টি হয় এক সঙ্গীতময় পরিবেশ।

দূরে ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে চাঁদপুর ষ্টীমার। বাতাসে ভেসে আসছে যাত্রীদের কোলাহল।

ষ্টেশনে পুলিশের ভীড়। যাত্রীদের তল্লাসী চলছে। নৌকোয় বসে বিনয়ের দৃষ্টিপথে আসে এই দৃশ্য। মুখে ফুটে ওঠে বিজয়ীর আনন্দ।

নৌকো এগিয়ে চললো 'বন্দরের' দিকে। নারায়ণগঞ্জের ওপারেই বন্দর। বন্দরের ঘাটে পাট বোঝাই বড় বড় নৌকো।

বিনয়ের নৌকো নিঃশব্দে এগিয়ে চললো পাট বোঝাই নৌকোর আড়ালে। বন্দরের উত্তর প্রান্তে এসে নেমে এলেন তাঁরা নৌকো থেকে। নিভৃত পথে এগিয়ে চললেন বিপ্লবীদ্বয়।

ভোর হয়ে এলো। গাছে গাছে জেগে উঠলো পাখী। মাঠে মাঠে সুরু হলো কৃষকদের আনাগোনা। মুরগীর ডাক কানে ভেসে আসতে লাগলো। মিঠে হাওয়ার কোমল স্পর্শ লাগলো ধান গাছের শীর্ষে। সবুজ ক্ষেতে অশ্রান্ত ঢেউ।

বর্ষার জল জমে রাস্তা হয়েছে দুর্গম। হাঁটু জল, বুক জল ভেঙ্গে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এগিয়ে চললেন দু'জন। অবশেষে বৈদ্যের বাজারের সন্নিকটে এসে উপস্থিত হলেন।

সুপতি রায় এখানে গ্রাম্য মুসলমানের পোষাক পালটে পরিধান করলেন ভদ্র পোষাক। বিনয়ের পোষাক অপরিবর্তিত রইলো।

বাবুর পেছনে চললো মুসলমান চাকর। কিন্তু বাবুর রূপকে বুঝি ম্লান করে দেয় চাকরের রূপ। মলিন পোষাকের আবরণ ভেদ করে রূপচ্ছটা হয় প্রকাশিত। সূর্যের আলো সে রূপকে আরো উজ্জ্বল করে।

পরিশ্রান্ত দেহ। ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ক্লান্ত দুটি চরণ। তবু বিরাম নেই পথ-চলার। এগিয়ে চললেন দু'জন নদীর ধারে।

নদীর পাড়ে অসংখ্য নৌকো দাঁড়িয়ে আছে যাত্রীর আশায়। বিপ্লবীদ্বয় ছোট একটি নৌকো ভাড়া করে ফেললেন। মুসলমান মাঝি নৌকো খুলে দিল।

মৃদু মিঠে হাওয়া বইছে। মেঘনার বুকে পাল তুলে এগিয়ে চলেছে ছোট্ট নৌকোটি। এখানে নিজেদের নিরাপদ মনে করলেন তাঁরা। পুলিশের সন্ধানী দৃষ্টি ভেদ করে চলে এসেছেন বহুদূর। এখানে পুলিশের কোন চিহ্ন নেই। তাই বিনয় ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিলেন কঠিন কাঠের উপর। জলের মৃদু গুঞ্জন তাঁর মনে মিঠে আমেজ এনে দেয়। নিদ্রায় চোখ দুটি বুজে আসে।

হঠাৎ বাতাসের গতি বৃদ্ধি পেল। দমকা বাতাস লাগলো পালে। মুহূর্তে আকাশের বুকে মেঘমালার সুরু হলো ক্রুদ্ধ গর্জন। নদীর জল মাতাল হয়ে উঠলো, পালের দড়ি ছিন্ন হবার উপক্রম।

বৃদ্ধ মাঝি আকাশের দিকে হতাশ ভাবে চাইলো। কসে ধরলো হালের বৈঠা, কিন্তু বড় ঢেউ এসে আঘাত হানছে নৌকোর গায়ে। টলমল করে উঠছে ছোট নৌকোটি। মাঝি নিজের অক্ষমতা জানালো একান্ত করুণ ভাবে। 'নদীতে আর নৌকো যাবে না,' বললো সে ভীত কণ্ঠে।

বিপ্লবীদ্বয় মাঝিকে সাহস দিয়ে বললেন, 'ভয় কি মাঝি, এগিয়ে চলো। একটু বাতাস বইছে মাত্র। এখনই বন্ধ হয়ে যাবে। ঐ তো মেঘগুলো উড়ে যাচ্ছে, মনে হয় ঝড় আসবে না।'

মাঝি জানে এখনই তীরের আশ্রয় না পেলে নদীর অতলে তলিয়ে যাবে তার নৌকো। তাই সে নৌকোর মুখ ফিরিয়ে দিল তীরের দিকে। দ্রুত হস্তে বৈঠা চালাতে চালাতে বললোঃ 'বাবু এই 'বিষনদী'তে প্রায়ই ঝড়ের তোড় থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন। তাই আমরা এখানে সাবধানে চলি।'

এই ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করেই এগিয়ে চলতে চায় বিপ্লবীদ্বয়। নদীর অতলে তলিয়ে যাওয়া সহজ। কিন্তু ইংরাজ সরকারের হস্তে বন্দী হওয়া চলতে পারে না। মাঝি কিছুতেই সাহস পাচ্ছে না বলে বাধ্য হয়ে তীরের দিকে যাবার অনুমতি দিতে হলো।

কিন্তু মন তাঁদের সন্দেহের দোলায় দুলতে থাকে। ঐ যে দূরে গ্রাম ওখানে যে কি আছে তাই বা কে জানে?

নূতন বিপদের সম্মুখে এসে দাঁড়াতে হবে মনে করে বিপ্লবীদ্বয় দৃঢ় হয়ে উঠলেন। বিপদকে ভয় করলে চলবে না, তার সঙ্গে পাঞ্জা ধরেই এগিয়ে চলতে হ'বে।

নৌকো তীরে এসে গেল। ঝড়ের গতি আরো বৃদ্ধি পেলো। দূরে দেখা যায় ফ্ল্যাগ ষ্টীমার ষ্টেশন। মাঝির মুখ থেকে জানা গেল ভৈরব গামী একখানা ষ্টীমার এখনই আসবে ষ্টেশনে।

ছোট ফ্ল্যাগ ষ্টেশন। লোকজনের ভীড় নেই। গোয়েন্দা পুলিশের দৃষ্টি এখানে নেই বলেই মনে হয়। সুপতি রায় আবার পোষাক পরিবর্তন করলেন। গ্রাম্য মুসলমানের পোষাকে বিনয়ের হাত ধরে এগিয়ে চললেন ষ্টেশনের দিকে।

ভৈরবের দু'খানা টিকিট কাটলেন। তারপর ষ্টীমারে তাঁদের শুরু হলো নূতন পথের যাত্রা।

এই পথে গোয়েন্দাদের শুভাগমন নেই বলেই কোন বিপদের সম্মুখে এসে দাঁড়াতে হলো না তাঁদের। ষ্টীমারে কৃষক যাত্রীদের ভীড়ে আত্মগোপন করে রইলেন।

যথাসময়ে ষ্টীমার পৌঁছে গেল ভৈরব ষ্টেশনে। এখানে জনসমাগম অনেক বেশী। যাত্রীদের হৈ হল্লায় চারিদিক মুখরিত।

কোলকাতাগামী ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে ষ্টেশনে। বিনয় ট্রেনের কামরায় উঠলেন। চারদিকে একবার ভাল করে দেখে কামরার এক কোণে মুখ লুকিয়ে বসে পড়লেন।

এখানে কোলকাতার টিকিট মেলে না। সুপতি রায় তাই ময়মনসিংহের দু'খানা টিকিট কেটে আনলেন।

ট্রেন চলতে সুরু করলো। কোন সমস্যা দেখা দেয় না। নিশ্চিত বসে রইলেন বিপ্লবীদ্বয়।

কিন্তু অকস্মাৎ নূতন এক বিপদ দেখা দিল কিশোরগঞ্জ ষ্টেশনে। গাড়ী প্ল্যাটফর্মে ঢুকতেই একদল পুলিশ ঢুকে পড়লো পাশের কামরায়। ভয়চকিত দৃষ্টিতে বিপ্লবীদ্বয় তাকালেন প্ল্যাটফর্মের দিকে। ভাবলেন, কি করা যায় এখন? এই বিপদ থেকে কি করে আত্মরক্ষা করা যায়? এখনই তো এসে যাবে পুলিশ এই কামরায়!

মাথায় বুদ্ধি এসে গেল চট্ করে। নামলেন তাঁরা প্ল্যাটফর্মে। এগিয়ে গেলেন দূরে দাঁড়ানো টিকিট কালেক্টারের দিকে। সামনে গিয়ে সুপতি রায় হঠাৎ জড়িয়ে ধরলেন টিকিট কালেক্টারের পা দু'খানা। চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে এলো।

অপ্রত্যাশিত এই ঘটনায় টিকিট-কালেক্টার বিস্মিত হয়ে এক পা

পেছনে হটে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে? ওরকম করছিস কেন?'

'বাবু আমাগো বাঁচান।' কেঁদে কেঁদে বললেন সুপতি রায়।

'কি হয়েছে বল না?'

'পুলিশ।'

'পুলিশ তোদের কি করবে?'—আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন টিকিট-কালেক্টার।

'আমাগো টিকিট নাই, ধইরা লইয়া যাইব।'

এবার টিকিট কালেক্টার বুঝতে পারলেন প্রকৃত ঘটনা। গ্রামের মুসলমান, কি করে জানবে কেন এত পুলিশের আমদানী। যাকে গ্রেপ্তার করার জন্য এত আয়োজন তার খবর এই অশিক্ষিত দরিদ্র কৃষকগণ কি করে জানবে।

'ওরে বোকা, পুলিশ তোদের ধরবার জন্য আসেনি, এসেছে অন্য কাজে।' বললেন টিকিট-কালেক্টার।

কিন্তু গ্রাম্য কৃষক এ কথা শুনে নিশ্চিন্ত নয়, কেবলই কেঁদে কেঁদে বলে, 'আমাগো বাঁচান কর্তা, আমাগো বাঁচান।'

'কোথায় যাবি তোরা?'

'যামু হেই বড় শহরে।'

'নাম কি শহরের?'

'হব থিকা যেইডা বড় শহর সেখানে যামু।'

টিকিট-কালেক্টার নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। কি মুস্কিল এই সরল লোক দুটিকে নিয়ে, কোথায় যাবে তাও বলতে পারে না।

'এই তোরা কোলকাতা যাবি?'—প্রশ্ন করলেন তিনি।

'হ, হ, ঐখানেই যামু।' খুশী হয়ে বললেন সুপতি রায়, 'আমাগো দুইডা কইলকাতার টিকিট কাইডা দেন কর্তা।'

'টাকা আছে তোদের সঙ্গে?'

'আছে বাবু আছে, অনেক টাহা আছে।' এই বলে ট্যাক থেকে পাঁচিশটি টাকা টিকিট-কালেক্টারের হাতে দিলেন সুপতি রায়।

টিকিট কালেক্টার টাকা হাতে নিয়ে একটু হাসলেন। পঁচিশ টাকাই ওদের অনেক টাকা! দরিদ্র কৃষকদের এই পঁচিশটি টাকা সংগ্রহ করতে কতই না কষ্ট করতে হয়েছে; একটি করে পয়সা জমিয়ে হয়তো চলেছে চাকরীর খোঁজে। জমি-জমা যা ছিল তা হয়তো চলে গেছে জমিদারের হাতে। তা না হলে কৃষক কখনও জমির মায়া পরিত্যাগ করে কোলকাতায় যায় চাকরী করতে?

সহানুভূতির সঙ্গে বললেন তিনি, 'চল তোদের টিকিট কেটে দেই।'

কোলকাতার দু'খানা টিকিট ওদের হাতে দিয়ে বললেন, 'বোস তোরা এখানে, কোন ভয় নেই।'

ততক্ষণে পুলিশদের তল্লাসী শেষ হয়ে গেছে। ট্রেন চলে গেল প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে। হতাশ পুলিশদল বোকার মত তাকিয়ে রইলো চলন্ত ট্রেনের দিকে।

বিপ্লবীদ্বয় পরের ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করেন।

ট্রেন আসতেই টিকিট-কালেক্টার ওদের দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন প্ল্যাটফর্মে। গার্ডকে বলে ইন্টার ক্লাসে তুলে দিলেন তিনি।

ইন্টার ক্লাস দেখেই সুপতি রায় বড় বড় চোখ করে বলে উঠলেন, 'ও বাব্বা, বাবু গো গাড়ীতে কেমনে বসুম?'

গার্ড হেসে বললেন, 'তোদের কোন ভয় নেই, যা বস গিয়ে।'

শূন্য ইন্টার ক্লাস। কাজেই ওদের পক্ষে এ কামরা নিরাপদ নয়। লোকের ভিড়েই আত্মগোপন করা সহজ। শূন্য কামরায় বিপদের আশংকা বেশী। কিন্তু উপায় নেই। এই কামরাতেই যেতে হবে। গার্ডের কথা শুনতেই হবে। নিজের ইচ্ছা আপাততঃ কাজে লাগবে না। কাজে লাগবে না অন্য কোন কৌশল। বিপদ যদি আসে, তবে বুদ্ধি ও শক্তির প্রয়োগ করতে হবে!

বিনয় মুখে গামছা চাপা দিয়ে শুয়ে পড়লেন এক কোণে। সুপতি রায় দাঁড়িয়ে রইলেন দরজার কাছটিতে গাড়ী। মন্থর গতিতে প্ল্যাটফর্ম পরিত্যাগ করলো।

অতি দ্রুতগতিতে অতিক্রম করে গেল ছোট ছোট ষ্টেশন। তারপর ময়মনসিংহ ষ্টেশনে এসে গাড়ী দাঁড়ালো।

সুপতি রায় জনতার ভীড় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলেন চুপ করে। দু'জন পুলিশ অফিসার এগিয়ে এলেন ইন্টার ক্লাসের কামরার দিকে।

চিন্তিত হলেন বিপ্লবী সুপতি রায়। চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো তাঁর ললাটে।

ঢুকে পড়লেন সেই কামরায় পুলিশ অফিসার দু'জন। সুপতি রায় দাঁড়িয়ে ছিলেন দরজার কাছেই অফিসার দু'জন ঢুকেই কামরার ভিতর চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'এই তুই কোথায় যাবি?'

'বাবু কইলকাতা।'—বললেন সুপতি রায় বিনীত ভাবে।

'কোলকাতা যাবি, তা দাঁড়িয়ে আছিস কেন?'—বললেন একজন।

'বাবুগো লগে কেমনে বসুম?'—জবাব দিলেন মুসলমান কৃষক বেশী সুপতি রায়।

'তবে এ গাড়ীতে উঠেছিস কেন?'—ঝাঁপিয়ে উঠলেন অপরে—পুলিশী মেজাজ প্রকাশ পেল।

সুপতি রায়ের চোখ দু'টা ছল ছল করে উঠলো, ভয়ে প্রায় কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে উঠলো, হাত জোড় করে বললেন তিনি, 'হুজুর, আমরা উঠতে চাই নাই, আমাগো জোড় কইরা তুইল্লা দিল। আইচ্ছা আপনেই কন, আমরা কি আপনাগো লগে বইতে পারি।

'কে তুলে দিল?'

চোখের জল মুছে বললেন সুপতি রায়. 'গাড-সাইব, আমাগো গেরামের কিনা?' 'ওটা ওখানে শুয়ে কেন?' বিনয়কে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন অফিসার। 'অর মাথাটা দপ্ দপ্ করতাছে। পাণিতে বিজ্জা বিজ্জা জ্বর অইছে একটু।' অফিসার বিনয়ের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। সুপতি রায় চাইলেন বাইরে। ষ্টেশনের

দেয়ালে বিনয়ের ছবি সাঁটা। ছবির কাছে লোকের ভীড়। সবাই বিস্ময়ে তাকিয়ে রয়েছে এই প্রিয়দর্শন ছেলেটির ছবির দিকে।

অফিসার দু'জন গল্পে মেতে উঠলেন। গাড়ী চলতে সুরু করলো।

'আশ্চর্য, দিনের বেলা দু'দুটো সাহেবকে গুলি করে পালালো, অথচ গ্রেপ্তার করা যাচ্ছে না?'

'বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করা অত সহজ নয়।' দ্বিতীয় অফিসার জবাব দিলেন।

'কিন্তু বিনয়ের চেহারা যে রাজপুত্রের মত। এমন রূপ যার সে কি করে লুকিয়ে থাকতে পারে?' সংশয় প্রকাশ করেন প্রথম ব্যক্তি।

'ওদের পক্ষে সবই সম্ভব। হয়তো এই ট্রেনেই হাওয়া হয়ে যাচ্ছে সবাইকে বোকা বানিয়ে।' স্পষ্ট জবাব দিলেন দ্বিতীয়জন।

গাড়ী এগিয়ে চলেছে আপন ছন্দে। বিনয় জ্বরের ভাণ করে শুয়ে আছেন, অফিসারদের আলোচনা শুনতে পাচ্ছেন।

জগন্নাথগঞ্জ ঘাটে ট্রেন এসে গেল। এবার আরো চিন্তার কথা। ষ্টীমার মোটেই নিরাপদ স্থান নয়। ষ্টীমারে পুলিশের চোখে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হবে কি?

কাছেই দাঁড়িয়ে আছে একদল পুলিশ। দৃষ্টি তাদের যাত্রীদের ওপর। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন দেহ ভেদ করে যায়। কিন্তু পুলিশের দৃষ্টি-পথেই তাঁরা ষ্টীমারে উঠে এলেন। মুসলমান কৃষক বলেই বোধ হয় সন্দেহ হলো না।

ষ্টীমারে বাটলারের সঙ্গে কথা বললেন সুপতি রায়। বিনয় এক কোণে বসে। মুহূর্তে খালাসিদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিলেন তাঁরা। খালাসিদের সঙ্গে সুরু হলো তাঁদের সুখ-দুঃখের কথা। যেন কত কালের চেনা।

সদলবলে পুলিশ ষ্টীমারে উঠে এলো। চললো ব্যাপক তল্লাসী।

ভদ্র যুবকদের উপরই তাদের আক্রমণ। একজন একজন করে যাত্রীর মুখ তারা নিরীক্ষণ করতে লাগলো।

খালাসীদের মাঝে বসে দেখতে পান বিনয় এই দৃশ্য। নিজের অজ্ঞাতে হাতের মুষ্ঠি দৃঢ় হয়ে উঠলো।

এগিয়ে এলো পুলিশ দল এবার খালাসিদের ঘরের দিকে। আশঙ্কায় বিপ্লবীদ্বয় চঞ্চল হয়ে উঠলেন। নীরবে ধরা দেওয়া চলবে না।

আরো এগিয়ে এলো পুলিশ।

হাত চঞ্চল হয়ে উঠলো। আর একটু, হ্যাঁ আর একটু এগিয়ে এলেই গর্জে উঠবে তাঁদের রিভলবার। মুহূর্তে প্রলয় ঘটে যাবে। রক্তে নদীর জল হবে লাল। বিপ্লবীদের অব্যর্থ নিশানা ব্যর্থ হবার নয়। নীরবে ধরা দেওয়া চলবে না।

কিন্তু পুলিশ আর এগিয়ে এলো না। ফিরে গেল অন্য দিকে।

বিপদ কেটে গেল।

ষ্টীমার গর্জন করে এগিয়ে চললো সিরাজগঞ্জের দিকে।

সিরাজগঞ্জ ঘাটে আবার পুলিশের তৎপরতা। কিন্তু জনকয়েক মুসলমানের সঙ্গে নেমে এলেন তাঁরা নিরাপদে এবং নিরাপদেই ট্রেনের কামরায় উঠে বসলেন।

ট্রেণের কামরায় যাত্রীদের মধ্যে চলছে মৃদু গুঞ্জন। পুলিশের জুলুমের প্রতিবাদ জানায় তারা নিজেদের মধ্যেই অনুচ্চ কণ্ঠে। লাঞ্ছনার গ্লানি ফুটে ওঠে সবার মুখে।

বৃদ্ধ যাত্রী একজন হঠাৎ বলে উঠলো, 'বিনয়কে আর গ্রেপ্তার করতে হবে না—ও যে বাঘের বাচ্চা।' সমবেত কণ্ঠে সবাই জানায় সমর্থন।

আট

বিনয়ের ঢাকা হত্যার খবর আগেই কোলকাতা পৌঁছে গেছে।

বিনয়কে লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ—কোলকাতা ও কোলকাতার বাইরে নানা স্থানে আশ্রয়।

৭নং ওয়ালিউল্লা লেন। সুরেশচন্দ্র মজুমদারের রিক্সা গ্যারেজ।

রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ক্লান্ত রিক্সাওয়ালারা ফিরে আসে গ্যারেজে। আবার ভোর হতেই গ্যারেজ হয়ে যায় শূন্য।

নীচে রিক্সাওয়ালাদের রাত্রির আশ্রয়। দোতলায় এক কোণের ঘরে বিপ্লবীদের গোপন আস্তানা। রাত্রি নিভৃতে তাঁরা হয়ে ওঠেন কর্মচঞ্চল। মুক্ত আকাশের সঙ্গে হয় পরিচয়। সারাদিন কাটে ঐ ছোট ঘরটির রুদ্ধ হাওয়ায়।

এদিকে শিক্ষিত ভদ্রলোকদের পথ-চলার প্রয়োজন নেই বললেই চলে। মজুর শ্রেণীর প্রাধান্য সুস্পষ্ট। আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের ভদ্র চেহারা যেন পালটে যায়। ভাব জমে যায় রিক্সাওয়ালাদের সঙ্গে।

এই গোপন আস্তানায় জমায়েৎ হলেন সুরেশচন্দ্র মজুমদার, রসময় শূর, শ্রীশ পাল, হরিদাস দত্ত প্রমুখ নেতাগণ। আজ বিনয়ের আসার কথা। এসে না পৌঁছান পর্যন্ত স্বস্তি নেই তাঁদের।

রসময় শূর রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছেন অধীর আগ্রহে। কারু মুখে কথা নেই। এক-একটি মুহূর্ত বাড়িয়ে দিচ্ছে তাঁদের দুশ্চিন্তা।

তাহলে—

হঠাৎ সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ। রসময় শূর চঞ্চল চরণে এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। ছিন্ন পোষাক পরিহিত এক মুসলমান যুবক ধীরে ধীরে উঠে আসছে। কে এই যুবক? রসময় শূর আরও এগিয়ে গেলেন।

'সীমাহীন আনন্দে বুকে জড়িয়ে ধরলেন বিনয়কে, বলে উঠলেন, 'বিনয় তুমি ইতিহাস সৃষ্টি করেছ।'

ছুটে এলেন শ্রীশ পাল, ছুটে এলেন সুরেশ মজুমদার, ছুটে এলেন হরিদাস দত্ত।

পথশ্রান্ত বিনয়ের মুখে ফুটে উঠলো অপূর্ব আত্মতৃপ্তি। বললেন তিনি, 'এ কৃতিত্ব আমার একার নয়। সমস্ত জাতির দীর্ঘদিনের সাধনার ফল প্রকাশ পেয়েছে আমার ভেতর দিয়ে।'

নয়

কোলকাতা লর্ড সিংহ রোডের গোয়েন্দা অফিসে মহা ব্যস্ততা লেগে গেছে। কর্তাদের মুখ গম্ভীর। রাত্রে ঘুম নেই। আহারে রুচি নেই। মেজাজ তাদের খিট্‌খিটে। কথায় কথায় রেগে যায়। ব্যর্থতার জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করে। বিনয় ওদের ধ্যান-ধারণা। বিনয় নামটি যেন জপ করে চলে একান্ত নিষ্ঠায়। কিন্তু কোথায় বিনয়? তাঁর কি সন্ধান আর মিলবে না? টিকটিকিরা ফিরে আসে মুখ কালো করে। কর্তারা মারমুখো হয়ে ওঠে। বেচারাদের চাকরী যায় আর কী! এত বড় গোয়েন্দা বিভাগ হিমসিম খেয়ে গেছে।

ইংরাজ সাম্রাজ্যকে বাঁচিয়ে রাখে এই গোয়োন্দা পুলিশ। তাদের ব্যর্থতায় সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবার উপক্রম। কিন্তু উপায় কী?—

বিনয়ের যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেছে তারা। তাই সেই হারানো যোগসূত্র খুঁজে বার করতে হবে। কিন্তু কি করি করে তা সম্ভব? এমন একজন লোক চাই যার মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপিত হ'তে পারে। কিন্তু কে সে লোক? কোথায় মিলবে এমন লোকটি? সবাই তো কারা-প্রাচীরের অন্তরালে। বাইরে যারা আছে তাদেরও সন্ধান কোথায় পাওয়া যাবে? বিনয়ের সঙ্গে তারাও হাওয়ায় মিলিয়ে

গেছে। অকস্মাৎ তাদের একটি নাম মনে হলো। সাফল্যের আশায় বুক ভরে' উঠলো। মৃদুহাসি ফুটে উঠলো মুখে।

মেজর সত্য গুপ্ত!

এই বিপ্লবী নেতার সঙ্গে নিশ্চয়ই গোপন পথে রয়েছে যোগাযোগ। কাজেই একে মুক্তি দিয়ে আনতে হবে বাইরে।

পরিকল্পনা প্রস্তুতের সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুত আদেশ চলে গেল মেদিনীপুর জেলে—মুক্তির আদেশ।

বেরিয়ে এলেন মেজর গুপ্ত।

হঠাৎ মুক্তির আদেশে রহস্য তাঁর কাছে অজানা রইলো না। বিদ্যুদ্বেগে এই খবর ছড়িয়ে গেল দিকে দিকে। পুলিশের দাবার চাল বুঝতে দেরী হলো না কর্মীদের। তাই দলের কাজে আরো গোপনতার বর্ম পরলেন।

মেজর গুপ্ত কোলকাতা চলে এলেন। এসে সেইদিনই গিয়ে উঠলেন এল্‌গিন রোডে সুভাষচন্দ্রের বাসভবনে।

সুভাষচন্দ্রের গোপন ঘরে চললো দু'জনের আলোচনা।

'রাসবিহারী ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে। বিনয়কে জাপানে পাঠানর প্রস্তুতি আমাদের এগিয়ে গেছে অনেক দূর।'—বললেন সুভাষ।

বিনয়ের কথা বলতে গিয়ে সুভাষের আবেগে কণ্ঠ জড়িয়ে আসে। আবেগ ভরা কণ্ঠে বলতে লাগলেন, দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের সম্ভাবনা রয়েছে পরিপূর্ণ ভাবে বিনয়ের মধ্যে। ওকে এখানে দীর্ঘদিন রাখা নিরাপদ নয়। এমন আত্মাহুতি দেবার সংকল্প যার, তার কাছেই তো দেশ নেতৃত্ব কামনা করে।'

মেজর গুপ্ত চুপ করে বসে রইলেন। তারপরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু জাপানে পাঠাবার জন্য যে টাকার প্রয়োজন তার—'

'তা প্রায় জোগাড় হয়ে এয়ে এসেছে'—বললেন সুভাষ, 'আচার্য্য প্রফুল্ল রায়কে বিনয় সম্পর্কে জানানো হয়েছে। তিনি নিজে পাঁচশো

টাকা এবং আরো টাকা জোগাড় করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অল্প দিনের মধ্যেই সে টাকা আমাদের হাতে আসবে।'

এই সময় রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্স চলছিল লণ্ডনে। ইংরাজ রাজপুরুষগণের তালবাহানায় অযথা সময় নষ্ট হ'তে থাকে। কিন্তু বাংলার বিপ্লবী কার্য্যকলাপের সংবাদে কর্তারা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। দ্রুত বৈঠকের কাজ চলতে লাগলো! স্পষ্টবক্তা তেজ বাহাদুর সপ্রু স্পষ্ট বললেন, 'রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্স-এর অর্ধেক কাজ তো বিনয় বসু একাই করেছেন।'

বিনয় যাচ্ছেন জাপানে। দলের নির্দেশ তাঁর কাছে পাঠানো হলো।

আরাকানের পথে, পাহাড় পর্বত অতিক্রম করে' জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাবেন মুক্তি সৈনিক জন্মভূমি পরিত্যাগ করে দেশেরই মু'ক্তর জন্য, অথবা জলপথে হ'বে তাঁর বিদেশ যাত্রা।

দশ

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে ধরণীর বুকে। কোলকাতার রাস্তায় পথচারীদের ব্যস্ততা। আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের পাশে এক বস্তিতে কর্মক্লান্ত শ্রমিকগণ ফিরে এল।

বস্তির সম্মুখে রাস্তার ধারে বস্তিবাসীদের বসলো নৈশ-আনন্দ-চক্র। জনকয়েক লোক খাটিয়ায় বসে গল্পে মেতে উঠলো। মদের বোতল এল। এল ছোলা ভাজা, মদের উগ্র গন্ধ ভেসে উঠলো বাতাসে।

সন্ধ্যার পর থেকেই পাড়ায় গোয়েন্দাদের পদসঙ্কেত। পাশেই দোতলা বাড়ীর দিকেই তাদের সতর্ক দৃষ্টি।

ওদিকে মদের আড্ডা জমে উঠেছে। দু'জন নূতন লোক এসে

আড্ডায় যোগ দিয়েছে। মাতালদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে উঠছে তাদের অট্টহাসির রোল। মদের বোতল তুলে নিল তারা হাতে। মুখে ঢেলে দিল খানিকটা গলগল করে'। নেশায় তাদের কথা জড়িয়ে আসছে যেন। মদে যখন সবাই চুর হয়ে উঠেছে তখন আড্ডা থেকে দু'জন উঠে দাঁড়ালো। টলতে টলতে এগিয়ে গেল দোতলা বাড়ীর দিকে। দরজা দিয়ে ঢুকে গেল মদের বোতল হাতে নিয়েই। সঙ্গে সঙ্গে দরজাও গেল বন্ধ হয়ে।

দরজায় আওয়াজ শুনে মেজর সত্য গুপ্ত সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন। বিস্মিত কণ্ঠে বললেন তিনি, 'সুপতি, রসময়!'

ঘর অন্ধকার। তিনজন পাশাপাশি বসে পড়লেন।

অনুচ্চ কণ্ঠে সুপতি রায় বললেন, 'দলের নির্দেশ বিনয়কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওকে জাপান পাঠাবার আয়োজন প্রায় সম্পুর্ণ হয়ে এসেছে। কিন্তু বিনয় এক আবেদন জানিয়েছে।'

'কি সে আবেদন?'—জিজ্ঞেস করলেন মেজর গুপ্ত।

'জাপান যাবার তার ইচ্ছে নেই। এখানেই আঘাতের পর আঘাত হেনে জাতির মন থেকে ভীরুতা ঘুচিয়ে দিতে চায় সে। নিজের বুকের তাজা খুন ঢেলে দেশকে আরো উর্বর করা প্রয়োজন। অনুর্বর জমিতে স্বাধীনতার ফসল ফলবে না। শুধু নিজের রক্তই নয়, ইংরাজ রাজপুরুষদের রক্তে মাটি হ'বে উর্বর। বিনয়ের তাই একান্ত ইচ্ছা যে 'এ্যাকশন'-এর পর 'এ্যাকশন' করেই এই মাটির বুকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে সে।'—সুপতি রায় বিনয়ের আবেদনের ভাষা জানালেন।

'আমাদের বিনয়ের এই ইচ্ছাটি ভেবে দেখা উচিৎ।'—সায় দিলেন রসময় শূর।

মেজর সত্য গুপ্ত চিন্তায় ডুবে গেলেন। বিনয়ের আবেদন তাঁর অন্তর স্পর্শ করলো। দেশের বুকে ইংরাজের উপর বার বার কঠিন আঘাত হানার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। এই কাজে

বিনয়ের নেতৃত্ব একান্ত কাম্য। আঘাতের পর আঘাত হেনে মৃত্যু ভয়কে দূর করে দিতে হবে স্বাধীনতা কর্মীদের মন থেকে।

বিনয় মূর্তি হয়ে দেখা দেয় তাঁর চিন্তা-জগৎ-এ। লাহোর কংগ্রেসে স্বেচ্ছাসেবক বিনয় যে অপূর্ব নিয়ম নিষ্ঠা, যে নেতৃত্বের পরিচয় দিয়েছিল সে সব ঘটনা মনে পড়ে যায়। বিনয়ের খাঁটি মনটির পরিচয় তখনই পাওয়া গিয়েছিল।

মেজর গুপ্ত দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'বিনয় সম্পর্কে আমাদের নীতি পরিরর্তন করাই উচিৎ হবে। তার আন্তরিক ইচ্ছায় রয়েছে আত্মাহুতি দেবার পবিত্র সঙ্কল্প। আচ্ছা জি-ও-সির সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করে জানানো হ'বে দলের নির্দেশ।'

'আমাদের পরবর্তী এ্যাকশন' সম্পর্কে কিছু ঠিক হয়েছে কী?' জিজ্ঞেস করলেন রসময় শূর।

এবার কোলকাতার বুকে প্রচণ্ড আঘাত হানতে হবে। রাইটার্স বিল্ডিংস আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য। গম্ভীর সুরে বললেন মেজর গুপ্ত।

'তার পরের 'এ্যাকশন' কি ঠিক হয়েছে?' জানতে চাইলেন সুরপতি রায়।

'নিশ্চয়ই—মেদিনীপুর।'

কিন্তু মেদিনীপুরে এমন কি কাজ করার আছে?'

'আছে।'—বলেন মেজর গুপ্ত, 'ইংরজে ম্যাজিষ্ট্রেট আমরা থাকতে দেব না ওখানে। মনে নেই নিরীহ সত্যাগ্রহীদের ওপর পেডি সাহেবের বর্বর অত্যাচার? সে অত্যাচারের শোধ নিতে হবে। জানিয়ে দিতে হবে ওদের যে, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার কসরৎ আমরাও জানি—

হঠাৎ রাস্তা থেকে গোলমাল ভেসে এল। চঞ্চল হয়ে উঠলেন সবাই। মেজর গুপ্ত সোজা বারান্দায় বেরিয়ে গেলেন। রাস্তায় পুলিশের ব্যস্ততা। পুলিশের গাড়ী ছুটে চলেছে দ্রুতগতিতে।

পুলিশের হঠাৎ এই তৎপরতার কারণ খুঁজে পেলেন না তাঁরা। কিন্তু কি করা যায় এখন? বাড়ীতে এভাবে গ্রেপ্তার হওয়া চলতে

পারে না। কিন্তু সম্মুখীন হলেও ভবিষ্যৎ কাজে ব্যাঘাত হবে। তাই কৌশলে রাস্তায় নেমে আসতে হবে রসময় শূর ও সুরপতি রায়কে। পেছনের দরজা খুলে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন তাঁরা।

বস্তির মাতাল আর বদমায়েসদের ওপর পুলিশের হামলা। জনকয়েককে বেঁধে নিয়ে গেল তাঁরা। মেজর সত্য গুপ্ত এক সময় বেরিয়ে পড়লেন আলগোছে।

এগারো

২রা সেপ্টেম্বর রাত্রির তৃতীয় যামে ওয়ালিউল্লা লেনের রিক্স গেরেজের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো একটি মোটর গাড়ী। গাড়ীর ভেতর থেকে নেমে এলেন অতি সন্তর্পণে হরিদাস দত্ত (এক কালে রডা কোম্পানীর এক গাড়ী মশার পিস্তল ও পঞ্চাশ হাজার কার্তুজ যিনি সরিয়ে ফেলেছিলেন গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান সেজে)। নিঃশব্দ পদে এগিয়ে চললেন গোপন আস্তানায় দিকে। দরজায় তিনটি টোকা দিতেই দরজা খুলে যায়।

বিনয় আজ অপূর্ব পোষাকে সাজিয়েছেন নিজেকে! রংচং-এ সিল্কের পাঞ্জাবী, চকচকে লুঙি, মাথায় ফেজ টুপি।

দু'জন নেমে এলেন সিঁড়ি বেয়ে। গাড়ীতে উঠতেই গাড়ী চলতে সুরু করলো তীব্র বেগে। একেবারে হাওড়ার পুল অতিক্রম করে শহরের ভেতর দিয়ে নির্জন গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে এসে গেল গাড়ী। তখনও রাত্রির অন্ধকার কাটেনি। পথচারীদের পথ-চলা সুরু হয়নি তখনো। নিস্তব্ধ পরিবেশে উল্কাবেগে ছুটলো গাড়ী। প্রভাতের আগেই তাঁদের চন্দননগর অতিক্রম করতে হবে। চট্টগ্রামের পলাতক বিপ্লবীদের সন্ধানে কোলকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেব উপস্থিত হয়েছে চন্দননগরে। তাই অতি সাবধানে অতিক্রম করা প্রয়োজন।

চন্দননগরের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে গাড়ী। চারিদিকে বিপ্লবীদ্বয়ের অতি সতর্ক দৃষ্টি। দেখা গেল সম্মুখ দিক থেকে ছুটে আসছে একখানা পুলিশের ভ্যান। বিপ্লবীদ্বয় চঞ্চল হয়ে উঠলেন। সোজা হয়ে বসলেন দু'জন রিভলবার হাতে ধরে।

কিন্তু বিপদ কেটে গেল। পাশ দিয়েই চলে গেল ওদের ভ্যান। গাড়ীতে টেগার্ট ও চট্টগ্রামের বন্দী বিপ্লবীদ্বয়।

বিনয়ের গাড়ী এসে থামলো চুঁচুড়ায় সরোজ রায়ের বাড়ীর সমনে। গাড়ী থামতেই সরোজ রায় ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলেন। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন বিনয়ের দিকে। তারপর বিনয়কে হাত ধরে নিয়ে গেলেন বাড়ীর ভেতর।

'এ ভাবে আপনাদের দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি—বলেন সরোজ রায়।

'বিপ্লবীদের অভিধানে বিস্ময় বলে কোন শব্দ আছে কী?' হেসে পাল্টা প্রশ্ন করেন বিনয়।

'চন্দননগরে রাত্রে পুলিশের হামলা হয়েছে। আমি নিজেও উপস্থিত ছিলাম সেখানে। দু'ঘন্টা পূর্বেই ফিরে এসেছি।' বলেন সরোজ রায়।

বিনয় মৃদু হেসে বললেন, 'আমরা প্রস্তুত হয়েই পথ চলে থাকি সরোজবাবু। টেগার্টের ভয়ে আমাদের পথ চলা বন্ধ হ'তে পারে না।'

বিনয় আবেগ ভরা কণ্ঠে আবার বলতে থাকেন, 'কোন সুদূর অতীতে বিপ্লবীদের পথ-চলা সুরু হয়েছিল তা আজও বন্ধ হয়নি। এই চলার পথ বেয়েই আসবে ভারতের মুক্তি, বিশ্বের মুক্তি।'

সরোজ রায় হুগলী জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রধান কেরানী। পুলিশের সঙ্গে তাঁর মিতালী। তাই সন্ধ্যা হতেই ম্যাজিস্ট্রেটের আরদালি গাড়ী নিয়ে এসে দাঁড়ালো। গাড়ীতে উঠলেন হরিদাস দত্ত, বিনয় বসু আর সরোজ রায়। আরদালী বসলো চালকের পাশে।

পুলিশের সমস্ত সতর্কতা ব্যর্থ করে স্বয়ং হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেটের গাড়ীতে নিরাপদে এসে পৌঁছে গেলেন তাঁরা ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে।

টিকিট আগেই কাটা ছিল। দু'জন ট্রেণে উঠে পড়লেন। সরোজ রায় নিলেন বিদায়।

রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করে গতির আনন্দে গজ্রে গর্জে এগিয়ে চললো ইঞ্জিন। ঘুমন্ত প্রকৃতির ঘুম বুঝি ভেঙ্গে যায়।

গাড়ী এসে থামল রাণীগঞ্জ ষ্টেশনে। প্ল্যাটফর্মের যাত্রীর ভিড়ের মধ্য থেকে অকস্মাৎ আওয়াজ ভেসে এল, 'বিনয় বসু,—লোম্যান-হডসন্।'

চঞ্চল হয়ে উঠলেন দু'জন। এক পাঞ্জাবী টিকিট চেকার প্ল্যাট-ফর্মে দাঁড়িয়ে বিনয়ের ইতিহাস বলে চলেছে। আর সম্মুখে দাঁড়িয়ে শুনছে সবাই অগ্নিক্ষরা এই উপাখ্যান।

গার্ডের বাঁশি বেজে উঠলো।

ধানবাদ আসতেই নেমে পড়লেন দু'জন ট্রেন থেকে। চারদিকে সন্ধানী দৃষ্টি নিবদ্ধ করে প্ল্যাট্‌ফর্ম থেকে বেরিয়ে এলেন রাস্তায়। তারপর ট্যাক্সি। কাটরাজগঞ্জ। মানভূমের ভেতর।

অনাথ দাস একান্ত আন্তরিক আগ্রহে অভ্যর্থনা জানান পলাতক বিনয়কে। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলে ওঠেন, 'আজ আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমার গৃহ আজ ধন্য হলো।'

পূর্ব পরিচিত নন তাঁরা। কিন্তু আদর্শ যেখানে এক সেখানে সখ্যতা পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না।

সবে মাত্র ভোর হয়েছে। পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়ে মণ্টু, ঘুম থেকে উঠেই দেখতে পেল নূতন লোক। দূর থেকে তাকিয়ে দেখে ছুটে গেল মার কাছে।

'কে এসেছে মা?'

'তোর নতুন কাকু!'

'কাকু!' এক ছুটে ফিরে এল বিনয়ের কাছে। বিনয় সস্নেহে ওকে টেনে নিলেন।

মণ্টু একটি কথার ঝরণা। ঝরঝর করে কথা ঝরতেই থাকে। সপ্রতিভ দু'টি চোখ। চঞ্চল দুটি চরণ। তার চলার ছন্দে কেউ বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। কোন শাসনের ভয় নেই তার।

'তোমার নাম কি?' জিজ্ঞেস করলেন বিনয়।

'তুমি আমার নাম জান না? সবাই আমার নাম জানে, আর তুমি কাকু হয়ে আমার নাম জান না?' শ্লেষ ফুটে উঠল মণ্টুর কণ্ঠে।

বিনিয় মিষ্টি হেসে বললেন, 'জানি তোমার নাম, কিন্তু বলবো না।'

'বেশ তবে আমিও বলবো না।' মুখ ভার করে ছুটে পালালো সে বাইরের দিকে। কিন্তু একটু পরেই ফিরে এল আবার তার বন্ধুদের সঙ্গে ক'রে। বন্ধুদের দেখাতে হবে যে তার নতুন কাকুকে। ওদের কি এমন কাকু আছে? বিনয়কে দেখিয়ে বললো মণ্টু, 'ঐ দেখ আমার কাকু। কি জানিস ভাই, ভারি দুষ্টু, কিছুতেই আমার নাম বলছে না।'

মণ্টুর মা এসে বললেন, 'এস ভাই ঠাকুরপো, ভেতরে এসো। সারা রাত তো ঘুম হয়নি। চান করে, চা খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নেবে।' তাঁর কণ্ঠে আন্তরিকতার সুর ধ্বনিত হয়।

বাংলা দেশে মা-বোনের অভাব নেই। ঘর ছেড়ে এলেও রাস্তায় রাস্তায় ঘর ছড়িয়ে থাকে। বিনয়ের মনে এক অপূর্ব তৃপ্তি নেমে এলো। এই মণ্টুর মা-বাবার অন্তরে যে দেশপ্রেম রয়েছে তার তুলনা হয় কি?

মণ্টুর বিনয়ের কাছে কাছে থাকে! বিনয়কে চোখের আড়াল হতে দেয় না। ওকে নিয়ে রোজ বেড়াতে যেতে হয় বিনয়কে। দেশ বিদেশের গল্প শোনাতে হয় ওকে। বিনয়কে ভালবাসে একান্ত ভাবে মণ্টু।

'ভাই 'ঠাকুরপো, তুমি কি জাদু জান?'—জিজ্ঞেস করলেন একদিন বৌদি।

'কেন বৌদি?' বিনয়ের চোখে বিস্ময়।

'কেন আবার কি? এই মেয়েটা কোনদিন আমাদের কথা শোনে

না, কিন্তু তোমার কথাতো অমান্য করে না দেখছি। ভাবছি, তুমি চলে গেলে মেয়েটা থাকবে কি করে!'—বললেন বৌদি।

বিনয় নীরব হলেন। চুপ করে বসে থাকতে দেখেই মণ্টু তার ছোট্ট হাত দুটি দিয়ে জড়িয়ে ধরে বিনয়ের গলা। বলে, 'কাকু তুমি আমার ওপর রাগ করে নাকি চলে যাবে?'

'তুমি মার কথা শোন না কেন?' বলেন বিনয়।

'মার কথা শুনলে, বললো তুমি যাবে না!

বিনয় ওর মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে বলেন, 'তুমি লক্ষ্মী মেয়ে, তোমাকে ফেলে কোথায় যাবো?

এমনি করে কেটে যায় দুটি মাস। এমন সময় কোলকাতা থেকে দলের নির্দেশ এসে গেল। ফিরে যেতে হবে কোলকাতায়।

মণ্টুকে কিছুই বলা হয়নি। কিন্তু কি করে যেন জানতে পেরেছে। তার চোখে আর ঘুম নেই। মিট্ মিট্ করে তাকিয়ে রয়েছে বিনয়ের দিকে।

গভীর রাত্রে যাত্রার সময় হয়ে এলো। এলো বিদায়—হয়তো চিরবিদায় নেবার পালা। বিনয় প্রস্তুত। কিন্তু দরজার কাছে আসতেই মণ্টু অকস্মাৎ পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল বিনয়কে। দুটি চোখে তার অশ্রুর বন্যা। বললো অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে, 'কাকু, তোমাকে যেতে দেবো না, না-না-না'

বিনয় ওকে কোলে তুলে নিলেন। আদর করে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, লক্ষ্মীটি তুমি কেঁদো না, আবার আসবো আমি।' কিন্তু মণ্টুর ঐ এক কথা, 'না-না-না, যেতে দেবো না।'

সময় নেই আর। এসেছে নেতার আহ্বান, এসেছে দলের নির্দেশ। ফেলে এসেছি মাকে, বাবাকে, আত্মীয়জনকে। পশ্চাতে রেখে এসেছি নিশ্চিন্ত জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য। পায়ে পায়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে অগ্নিজীবনের আগ্নেয় স্বাক্ষর। সময় কোথায় আর নিঃশ্বাস নেবার?

মা জোর করে মণ্টুকে কোলে টেনে রাখলেন, কিন্তু চিৎকার করে

কেঁদে উঠলো সে। বিনয় নেমে এলেন রাস্তায়। চোখ ছুটো ভিজে-ভিজে ওঠে কেন ?.....মণ্টুর কান্নার শব্দ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এলো।

বারো

কাটরাজগড় থেকে এসে ওয়ালিউল্লা লেনে আবার ছ' রাত্রি যাপন করে বেলেঘাটার আশ্রয়ে এলেন বিনয় বসু।

সুরেশ মজুমদার নিয়ে এলেন তাঁকে এখানে। বেলেঘাটা মেন রোডের ওপর এক আত্মীয়ের বাড়ী।

ব্যারাক বাড়ীর ঠিক উল্টো দিকের একটি বাড়িতে টেগার্টের পার্সোন্যাল এসিষ্টেণ্ট। এ বাড়ীর দিকে তার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। কেবলি সন্দেহ হয় ও বাড়ীর মালিককে।

সেদিন রাত ন'টায় নিঃশব্দে এসে পড়লেন সুপতি রায় আর সুরেশ মজুমদার। বাড়ীতে প্রবেশ পথে অকস্মাৎ যেন একটি পরিচিত মুখ তাঁদের চোখে পড়লো। ব্যারাক বাড়ীর উল্টো দিকে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটি। সুরেশ মজুমদার দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু কোথায়, লোকটিকে তো আর দেখা যায় না। অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে।

বিপ্লবীদের মনে চিন্তার মেঘ।

লোকটি নিশ্চয়ই গোয়েন্দা বিভাগের লোক। পলাতক সুপতি রায়কে বোধ হয় ঢুকতে দেখেছে। সুতরাং আজ রাত্রে নিশ্চয়ই হামলা হবে এখানে।

বিনয় বললেন, 'আমার মনে হয়, ছ'এক ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশ এসে যাবে। কিন্তু আমরা কি এখন এ স্থান পরিত্যাগ করতে পারি ? জি-ও-সি ও মেজর গুপ্ত আসবেন রাত সাড়ে দশটায়। সাড়ে দশটা

পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে। জি-ও-সির আদেশের জন্য আমাদের অপেক্ষা না করা ঠিক হবে না।

রিভলবারে গুলী ভরে নিলেন বিনয়। আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন সবাই। হয়তো এবার বৃটিশ সিংহের সঙ্গে হবে রক্তাক্ত সংগ্রাম!

হঠাৎ সিঁড়ির ওপর থেকে পদ শব্দ ভেসে এলো। রিভলবার হাতে নিয়েউঠে দাঁড়ালেন বিনয়। সুরেশ মজুমদার সবার আগে এগিয়ে গেলেন সিঁড়ির দিকে। একজন মাত্র লোক উঠে আসছে দ্রুত চরণে।

'কে?' জিজ্ঞেস করলেন সুরেশ মজুমদার।

আগন্তুক অনুচ্চ কণ্ঠে জবাব দিলেন, আমি রসময় শূর।

যাক্ নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে। রিভলবার পকেটে রাখলেন বিনয়।

'কি খবর রসময়বাবু?'

তাড়াতাড়ি বললেন রসময় শূর, 'জি-ও-সির আদেশ, আমাদের মুহূর্তে এই আশ্রয় পরিত্যাগ করতে হবে। আজই এখানে পুলিশের হামলা হ'বে। পুলিশের মারফৎ এই মাত্র খবর পেয়েছেন জি-ও-সি।'

মুহূর্তে সবাই প্রস্তুত হয়ে পেছনের দরজা দিয়ে নেমে এলেন রাস্তায়। আর সুরেশ মজুমদার পুলিশের অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। ভালমানুষটির মত বিছানায় এলিয়ে দিলেন দেহ।

তিন মিনিট পর রাস্তায় এসে দাঁড়ালো পুলিশের গাড়ী। বুটের আওয়াজ! নিঃশব্দ পাড়া জেগে উঠলো। বাড়ীটিকে ঘেরাও করা হলো তৎপরতার সঙ্গে। রাইফেল কাঁধে পাহারা বসে গেল। একদল রিভলবার হাতে উঠে এল সিঁড়ি বেয়ে। পেছনে রাইফেল হাতে জনকয়েক সৈনিক।

কিন্তু কোথায় বিনয়? চিহ্নমাত্র নেই তার! হতাশ পুলিশ দল। ব্যর্থতার জ্বালায় গর্জে উঠলো একজন অফিসার।

'এ বিছানা কার?'

'আমার।' জবাব দিলেন সুরেশ মজুমদার শান্ত কণ্ঠে।

আরো উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন অফিসারটি, 'আর সব গেল

কোথায় ? এই মাত্র এখানে যারা ছিল তাদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না তো ?'

'আমিই এ ঘরে ছিলাম, আমিই এ ঘরে আছি, আর একমাত্র আমিই এ ঘরে রাত্রি যাপন করি।'

'হুঁ,' তল্লাসী করে ভাল করে'—গর্জে উঠল যেন বৃটিশ সিংহ।

এক জোড়া জুতো দেখে এবার অফিসারটির মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো। বিদ্রূপ করে বললেন, 'আপনার ঘরে অন্ততঃ একজন মহাপুরুষের শুভাগমন হয়েছিল, তাঁর চিহ্ন রয়ে গেছে, হয়তো অসাবধানতায় !

'কি সে চিহ্ন'—চমকে উঠলেন সুরেশ মজুমদার।

'ঐ জুতো জোড়া কি আপনার ? অফিসারের কণ্ঠে শ্লেষ !

'নিশ্চয়ই আমার।'—তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন সুরেশ মজুমদার।

'একবার যে তার প্রমাণ দিতে হবে আমাদের সামনে।'—বিদ্রূপের হাসি হাসলেন অফিসারটি। যেন বৃটিশ সিংহ তার ধারালো দাঁত দেখালো।

সুরেশবাবু ধীরে ধীরে উঠে এলেন। শঙ্কাকুল মনে পা' দুটি গলিয়ে দিলেন জুতোর মধ্যে। আশ্চর্য—একেবারে ঠিক খাপে খাপে লেগে গেছে। হাত দিয়ে টিপে টিপে ভাল করে পরীক্ষা করলেন অফিসার। হতাশ হলেন তিনি।

'সন্দেহ নিশ্চয়ই দূর হয়েছে আপনার ?' মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন সুরেশ মজুমদার।

কিন্তু খালি হাতে কি করে থানায় ফিরে যাওয়া যায় ? তাই অফিসারটি বললেন, 'আপনাকেই আমরা গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হচ্ছি, চলুন থানায়।' যেন সুরেশ মজুমদারই বিনয় বসু।

তের

মাঠের রাস্তা দ্রুত অতিক্রম করে রেলপুলের কাছে এসে ট্যাক্সিতে চেপে বসেন ওঁরা তিনজন—বিনয় বসু, সুপতি রায় আর রসময় শূর।

দুটো পুলিশের গাড়ী দ্রুতগতিতে উল্টোদিক থেকে এসে তাঁদের পাশ দিয়ে চলে গেল। বিনয় একবার চাইলেন চকিতে পুলিশের গাড়ীর দিকে। মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো।

ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো সাহানগরের একটি বাড়ীর সামনে। মৃদু আঘাত করতেই খুলে গেল দরজা।

আশ্রয় মিলে যায়। বিনয় অবস্থান করবেন ওখানে। রসময় শূর, সুপতি রায় তাই আবার নেমে এলেন রাস্তায়। পৌঁছে দিতে হ'বে বিনয়ের নিরাপত্তার খবর জি-ও-সির কাছে। তাঁর চিন্তার যে অবধি নেই।

রাত্রি শেষে আবার ফিরে এলেন রসময় শূর, সুপতি রায়।

বিনয়ও আগ্রহান্বিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'মনে হচ্ছে নূতন খবর আছে?'

'নূতন আশ্রয়ের সন্ধান মিলেছে, এখনই আমাদের এই স্থান পরিত্যাগ করতে হবে।' জবাব দিলেন সুপতি রায়।

'এই স্থান কি নিরাপদ নয়?' আবার জিজ্ঞেস করেন বিনয়।

রসময় শূর বললেন, 'নিরাপত্তার প্রশ্ন নয়, জি-ও-সির নির্দেশ।'

'রাইট ও—' বললেন বিনয়, 'কিন্তু বেলেঘাটার খবর কি?'

'বেলেঘাট্যর বাড়ীতে পুলিশ হামলা হয়ে গেছে। সুরেশ মজুমদার এখনও বসে আছেন থানায়।' বললেন সুপতি রায়।

বিনয় জিজ্ঞেস করলেন, তাঁকে কি গ্রেপ্তার করা হয়েছে?'

'মনে হয় তাঁকে প্রশ্নবাণে ঘায়েল করার চেষ্টা হ'বে। তবে তিনি মুক্তি পাবেন ভোরের দিকে একথা নিশ্চয় করে বলা চলে।'

'ঐ নিশ্চয়তার কারণ কি?'

'জি-ও-সি বললেন।'

'তোমার ফেলে আসা জুতো সমস্যা সৃষ্টি করেছিল, বুঝলে ?' স্মিত হাস্যে বললেন, রসময় শূর।

'সমাধান হলো কি করে ?'

'সুরেশ মজুমদার নিজের বলে চালিয়ে দিয়েছেন।'—হেসে জবাব দিলেন সুপতি রায়।

মহা দুঃখ প্রকাশ করে বললেন বিনয়, 'কিন্তু বেচারা পুলিশদের জন্য বাস্তবিক আমার কষ্ট হয়। এত আয়োজন ওদের ব্যর্থ হয়ে গেল।'

রসময় শূর হেসে বললেন, 'চলো তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি পুলিশের কাছে ওদের দুঃখ যখন সইতে পারছো না।'

'তবে আপনাকেও যে থাকতে হবে আমার সঙ্গে।' বললেন বিনয়।

হাসির রোল উঠলো। একটু পর নেমে এলেন তাঁরা রাস্তায়। এগিয়ে চললেন সাহানগর রোড ধরে পশ্চিম দিকে। কিং জর্জ ডকের পাশ দিয়ে বজবজের নূতন রাস্তার নির্জনতায় হেঁটে চললেন তিনজন।

পার্টির সভ্য রাজেন গুহ অধীর আগ্রহে বিপ্লবীদের আগমন প্রতীক্ষা করছিলেন। ওঁদের দেখতে পেয়ে সস্নেহে জড়িয়ে ধরলেন বিনয়কে।

সকাল আটটা বত্রিশ মিনিটে বজবজ রোডের মোড়ে একখানা বাস এসে দাঁড়ালো। নেমে এলেন হরিদাস দত্ত। বিনয়-এর সঙ্গে তাঁর দেখা করা একান্ত প্রয়োজন। এগিয়ে চললেন, কিন্তু চলতে চলতে তাঁর মনে হলো কেন যেন তাঁকে অনুসরণ করছে।

পকেট থেকে চট করে নিলেন সিগারেট তুলে। সুতরাং তাঁকে দাঁড়াতে হলো দেশলাই জ্বালাবার জন্য।

পেছনের লোকটা চট করে থাকতে না পেরে এগিয়ে আসতে বাধ্য হলো। হ্যাঁ, চিনেছেন, গোয়েন্দা বিভাগের ডি এস- পি উপেন দত্ত।

এগিয়ে চললেন হরিদাস দত্ত।

রাজেন গুহের বাড়ী পিছনে পড়ে রইলো। দু'মাইল রাস্তা অতিক্রম করে এসে দাঁড়ালেন হরিদাস দত্ত এক খড়ের বাড়ির সামনে। উপেন দত্ত তখনও তাকে অনুসরণ করছে। সে এবার থেমেছে।

হরিদাস দত্ত হাঁক দিলেন, ভালোমানুষটির মত, 'সলিম বাড়ী আছ?' ভাঙ্গা ঘর থেকে বেরিয়ে এল ছিন্ন লুঙ্গি পরিহিত এক মুসলমান বৃদ্ধ। সেলাম জানালো হরিদাস দত্তকে। গরিবের ঘরে মনিবের আগমন—কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো তার বুক। এই বাবুই তাকে কাজ করে দিয়েছেন এক ঠিকাদারী ফার্মে।

সলিম হাত জোড় করে বললো, 'বাবু কিছু কাছ আছে কি?'

'না সলিম এমনিই এসেছি তোমার সঙ্গে দেখা করতে। অনেকদিন দেখা নেই, ভাবলাম কেমন আছ একবার দেখে যাই। তা, ভাল আছ তো?'—হেসে জিজ্ঞেস করলেন হরিদাস দত্ত?

'আপনার দোয়ায় ভালই আছি হুজুর।'—বললো সলিম।

বাইরে তাকালেন হরিদাস দত্ত। উপেন দত্তকে দেখা যাচ্ছে না। নেমে এলেন রাস্তায়! উপেন চলে গেছে। অনুসরণের কাজ বুঝি শেষ হয়েছে তার।

মিলেছে সন্ধান গুপ্ত আস্তানার, খুসীমনে ফিরে যাচ্ছে ডি-এস-পি। এবার হয়তো সলিমের বাড়ীতেই হানা দেবে সদলবলে।

সলিমের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হরিদাস দত্ত সোজা গেলেন কিং জর্জ ডাক মিঃ মিলের কাছে। মিঃ মিল কিং-জর্জ ডকের একজন অফিসার। তার সঙ্গে চলছে বিপ্লবীদের গোপন কারবার। তারই মাধ্যমে চলেছে বিপ্লবীদের গোপন কারবার। তারই মাধ্যমে জলপথে বিনয়কে বিদেশে পাঠাবার আয়োজন সমাপ্ত। আজই জাহাজ ছাড়বে। এই জাহাজেই বিনয়ের চলে যাবার কথা।

মিঃ মিল অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। হাত ঘড়ির দিকে চাইছিলেন বার বার। কয়েক মিনিট মাত্র সময় আছে জাহাজ ছাড়বার।

হরিদাস দত্ত দ্রুতপদে এগিয়ে এলেন। মিঃ মিল অধীর ভাবে

বললেন, 'কোথায় তোমার লোক? জাহাজ যে এখনই ছাড়বে। এই সুযোগ আর আসবে না। একজন খালাসীকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে অসুস্থ বলে। তারই স্থানে বিনয়কে গ্রহণ করার কাজ সম্পূর্ণ। কাজেই পলাতক বিপ্লবীর পক্ষে এ সুযোগ ছাড়া ঠিক নয়।'

'আমাদের কর্মধারা পালটে গেছে'—বললেন, হরিদাস দত্ত।

'কিন্তু তুমি যে টাকা দিয়েছ তা যে খরচ হয়ে গেছে মিঃ দত্ত।' আবেদন জানালেন মিল।

একটু হেসে বললেন হরিদাস দত্ত, 'কিছু ভাবনা নেই মিঃ মিল, টাকা তো খয়চ করার জন্যই দেওয়া হয়েছে।'

'প্রায় সব টাকাই সারেং নিয়ে নিয়েছে, আমার ভাগ্যে কিছুই পাইনি।'

হরিদাস দত্ত মৃদু হেসে মিঃ মিলের হাতে দশ টাকার কয়েকটি নোট গুজে দিলেন।

চৌদ্দ

বজবজ রোডে রাজেন গুহের বাড়ী। স্নিগ্ধ শান্ত আনন্দময় পরিবেশ। নগরের কোলাহল এখানে পৌছয় না। গোয়েন্দাদের দৃষ্টির আড়ালে বিপ্লবীদের নূতন আস্তানা বিনয়কে কেন্দ্র করে বেশ জমে উঠলো।

রাজেনবাবুর স্ত্রীও দলের সঙ্গে যুক্ত। কাজেই এখানে বিপ্লবীদের গোপনে যাওয়া-আসার অসুবিধা নেই। বৌদির সতর্ক দৃষ্টি কিন্তু বিনয়ের দিকে। তাঁর পরিচর্য্যা করবার মহান ব্রত তিনি হাতে তুলে নিলেন।

শীতের আকাশে সেদিন কালো মেঘের সমাবেশ। হু হু করে বইছে ঠাণ্ডা হওয়া। বিকেলের দিকে সুরু হলো বৃষ্টি। মুষলধারে বর্ষণ আর ঠাণ্ডা হাওয়ার মধ্যেই রসময় শূর, সুপতি রায়, প্রফুল্ল দত্ত,

নিকুঞ্জ সেন বৃষ্টিধারায় স্নান করে এক এক করে রাজেনদার বাড়ীতে এসে প্রবেশ করলেন।

বৌদি বিস্ময়ে তাকালেন বিপ্লবীদের দিকে। 'বিপ্লবের সাধনায় এমনি করেই কি নিজেদের অস্বীকার করতে হয়।'—প্রশ্ন করলেন বৌদি ভিজে গলায়।

রসময় শূর হেসে জবাব দিলেন, 'নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তার মূল্য দিতে হয়। ফাঁকি দিয়ে মহৎ কাজের সমাধান করা যায় কি ?'

'ফাঁকি দেওয়ার মনোবৃত্তি আমি অস্বীকার করি।'—বলতে লাগলেন বৌদি, 'কিন্তু দেহটাতো আর লোহার তৈরী নয়। তোমাদের চলার পথে কঠোরতার বোঝা কেবলই চাপাচ্ছ দেহের ওপর। অতিরিক্ত বোঝা বহন করে একদিন ভেঙে পড়বে এই দেহযন্ত্রটি।'

'তা পড়বে বটে' হেসে বললেন সুপতি রায়, 'সংসারে সবই অনিত্য।'

হো হো করে হেসে বললেন রসময় শূর, 'দোহাই বৌদি, তোমার তত্ত্বকথা একটু বন্ধ রাখো। এখন এক কাপ চা না পেলে বাস্তবিকই আমাদের দেহযন্ত্র বিকল হয়ে পড়বে।'

বৌদির মুখে হাসি দেখা দিল। তিনি চা আনতে গেলেন।

বিপ্লবীরা গোল হয়ে বসলেন একখানি মাদুরের ওপর। জানালায় বৃষ্টির ঝাপ্‌টা।

একটু পরেই ফিরে এলেন বৌদি। একটি করে কাপ সবার সামনে নামিয়ে রাখলেন।

'শুধু চা দিলেন বৌদি ?'—বললেন বিনয়।

'বৌদি বলে উঠলেন, আচ্ছা পেটুকরাম তুমি, এই তো একটু আগে একথালা খাবার খেলে।'

সুপতি রায় সাবধান করে দিলেন, 'ওকে সাবধানে রাখবেন বৌদি। ভয়ানক পেটুক, সুযোগ পেলেই খেয়ে উজাড় করবে সব।'

সবাই এক সঙ্গে হেসে উঠলেন।

তারপর বৌদি সুপতি রায়কে বললেন, 'এজন্য তোমার ভাবনা নেই, তোমার প্রাপ্য নিশ্চয় তুমি পাবে। একা বিনয়ের ওপর দোষ চাপিয়ে তোমার লাভ? পেটুক তোমরা কেই-বা কম? খাবার গন্ধ পেলে আর রক্ষা নেই।'

আবার হাসির রোল উঠলো। হাসতে হাসতে চলে গেলেন বৌদি নিজের কাজে!

বিপ্লবীদের আলোচনা সুরু হলো।

রসময় শূর বললেন,—'জি-ও-সি'র নির্দেশ এসে গেছে। ডিসেম্বর মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে রাইটার্স বিল্ডিংস আক্রমণ করতে হবে। আর মাত্র কয়েকদিন সময় আমাদের হাতে আছে। এর ভেতর সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করতে হবে।'

বিনয় খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন। বললেন, 'এই এ্যাক্‌শন করতে হবে নিখুঁত ভাবে। প্রথমেই প্রয়োজন রাইটার্স বিল্ডিংস-এর সমস্ত খবর সংগ্রহ করা। প্রতিটি দপ্তরের বিস্তারিত খবর প্রয়োজন। কিন্তু কি করে তা সম্ভব হবে? অসংখ্য দপ্তরখানায় কোথায় গিয়ে প্রথম আক্রমণ চালাতে হ'বে তা আমাদের বিশেষ করে জানতে হ'বে। এই প্রাথমিক কাজের ওপর নির্ভর করবে আমাদের সাফল্য। কাকে দিয়ে এই সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভব?'

কথা শেষ করে বিনয় সবার মুখের দিকে চাইলেন আগ্রহ ভরে। কিন্তু সেই দৃষ্টি যেন পার্থিব জগৎ ছাড়িয়ে কোন অমৃত লোকের পানে প্রসারিত হয়েছে। তাঁর কানে যেন প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠছে শ্যামরূপী মৃত্যুর পাগল-করা বাঁশীর মায়াবী সুর!

নীরবে কেটে যায় ছ'মিনিট। কারো মুখে কথা নেই।

অকস্মাৎ নিঃশব্দ ভঙ্গ করে বলে উঠলেন প্রফুল্ল দত্ত, 'ইংরাজের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রদুর্গের সমস্ত খবর সংগ্রহ করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে আমি প্রস্তুত। এ কাজ খুব কষ্টসাধ্য হবে না। আমার যাতায়াত রয়েছে। আমি বিশেষভাবে পরিচিত অফিসারদের কাছে। তবে ফণি গুপ্তকে সঙ্গে পেলে কাজ আরো সহজসাধ্য হবে।'

বিনয় খুশী হয়ে উঠলেন। বললেন, 'সম্ভব হলে একটি নক্সা তৈরী করে ফেলবেন।'

রসময় শূর বললেন, তোমাকে সাহায্য করার জন্য যথাসময়ে ফণি গুপ্তকে (মেজর সত্য গুপ্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ফণি গুপ্ত) পাঠানো হ'বে। তবে ফণি গুপ্ত পৃথকভাবে ও সংবাদ সংগ্রহ করবে।'

সুপতি রায় রসময় জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাদের আগামী এ্যাক্শনের সৈনিকদের নাম স্থির করা হয়েছে কী?'

'এখনও জানা যায়নি তাদের নাম: তবে নিশ্চয় করে বলা চলে যে, বিনয় এ এ্যাক্শনে থাকবে and he will lead the expedition.'—বললেন রসময়।

অকস্মাৎ উল্লাসে কলরব করে উঠলেন বিনয়, 'Now the opportunity comes—ইংরাজ এবার বুঝতে পারবে বি-ভী-র life for life সিদ্ধান্তের স্বরূপ কি? What it means'—দু'হাতে বিনয় রসময়কে জড়িয়ে ধরলেন, 'রসময়দার মার কাছে কিন্তু আমি মিছে কথা বলিনি। বলেছিলাম, জেলে জেলে পচে মরার জন্য তোমার ছেলে জন্মগ্রহণ করেনি।—Was I not correct?'

রাত্রি গভীর হয়ে আসে। বৃষ্টি এখনও থামেনি। থেকে থেকে মেঘগর্জন ভেসে আসে। বিপ্লবীদের আলোচনা হয় সমাপ্ত।

বৌদি এসে দাঁড়ালেন দ্বার পথে। মৃদু হেসে বললেন, 'তোমাদের খাবার প্রস্তুত। গরম খিচুড়ী।'

'Bravo, চমৎকার।' বলে উঠলেন নিকুঞ্জ সেন।

খিচুড়ীর সঙ্গে বেগুন ভাজা আর ডিম ভাজা।

আহার শেষ করে রসময় একবার ঘড়ির দিকে চাইলেন।

বৌদি জিজ্ঞেস করলেন, 'এত তাড়াতাড়ি করছো কেন?'

'এখনই আমাদের যেতে হ'বে।' বললেন রসময়।

'এখনও যে ঝড় থামেনি।'—অনুনয় জানালেন বৌদি।

'ঝড় আমাদের চলার পথের বন্ধু'—জবাব দিলেন রসময়।

এক এক করে ওঁরা নেমে এলেন রাস্তায়। মিলিয়ে গেলেন গভীর অন্ধকারে।

বৌদি নিশ্চল প্রস্তর মূর্ত্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন দৃষ্টি প্রসারিত করে বিপ্লবীদের গমন পথে। বৃষ্টির ঝাপ্‌টা এসে গায়ে লাগছে।

ওরা কি মানুষ ? না দেবতা ?……

পনেরো

ডিসেম্বর মাস এসে গেল। ১৯৩০ সনের ডিসেম্বর। প্রফুল্ল দত্ত ও ফণি গুপ্ত নিখুঁতভাবে সংগ্রহ করে আনলেন রাইটার্স বিল্ডিংস্-এর সমস্ত খবর। একটি নক্সাও তৈরী হয়ে গেল।

৩রা ডিসেম্বর। ভোর বেলাই মেজর গুপ্ত রাস্তায় এসে একটি চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে উঠে বসলেন। ট্যাক্সি এ-পথ সে-পথ ঘুরে দীর্ঘ রাস্তা অতিক্রম করে এসে দাঁড়ালো সুভাষচন্দ্রের বাড়ীর সম্মুখে।

মেজরকে দেখেই স্মিতহাস্যে আহ্বান জানালেন সুভাষ। মেজর অভিবাদন জানালেন আজ সামরিক কায়দায়।

মেজর বললেন, 'আমাদের আয়োজন নিখুঁত হয়েছে একথা স্বীকার করতেই হবে। সৈনিক নির্বাচনে আমাদের ভুল হয়নি। বিনয় বসু, দীনেশ গুপ্ত, সুধীর গুপ্ত (বাদল) এদের প্রত্যেককে আপনি ব্যক্তিগত ভাবে জানেন।

দৃঢ়কণ্ঠে বললেন সুভাষচন্দ্র, 'আমাদের দলের প্রতিটি সৈনিকের আত্মাহুতি দেবার সঙ্কল্প ও দৃঢ় মনের পরিচয় বহু কাজের ভেতর দিয়ে আমার কাছে প্রকাশ পেয়েছে। আমার অটুট বিশ্বাস আছে তাদের ওপর। স্বাধীনতা সংগ্রামে যে নিয়মশৃঙ্খলা কাম্য তা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়েছে দলের কার্যকলাপে। ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স যে আঘাত হানবে তাতে ইংরাজ সরকারের বুকের পাঁজর ঝাঁঝরা হয়ে যাবে। ইংরাজের কাপুরুষতার মুখোস খুলে যাবে।'

জি-ও-সির মুখে এক অপূর্ব ভাব-দীপ্তির অভিব্যক্তি। ভবিষ্যতের শোষনমুক্ত স্বাধীন ভারতের রূপ তাঁর চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। দেয়াল ঘড়িতে টং টং করে আটটা বাজলো। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে আবার সুভাষচন্দ্র বললেন, 'হ্যাঁ, ৮ই ডিসেম্বর এ্যাক্‌শনের দিন ধার্য্য করা হলো। আর দেরী করা উচিৎ নয়। এ্যাক্‌শনের আগে রাইটার্স বিল্ডিংসের সমস্ত দপ্তরগুলো দীনেশ ও বাদলকে দেখিয়ে আনতে পারলে ভাল হয়ে। কিন্তু তা কি সম্ভব হ'বে মেজর ?'

ষোল

৮ই ডিসেম্বর। ১৯৩০ সন। খোলা জানালা পথে সকালের মিঠে রোদ এসেছে ঘরে। বিনয় গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। বাতাসে দুলছে মশারী।

বৌদির কাজ যেন আজ আর এগুতে চায় না। উৎসাহ লাগে না, মন লাগে না। উদাস নয়নে তাকিয়ে থাকেন উর্দ্ধে। চোখ দুটি কেবলই ভিজে ভিজে আসে। বার বার আঁচল দিয়ে মুছে ফেলতে হয়।

আজকে বিনয়কে বিদায় দিতে হবে। দিতে হবে বিদায় চির দিনের মত! নিজের অজ্ঞাতেই এসে দাঁড়ালেন বিনয়ের শয্যা পাশে। কি সরল সুন্দর-পবিত্র মুখ। নেই কোন গ্লানি। আছে শুধু প্রশান্তি। বৌদির দু'চোখে নেমে আসে অশান্ত ধারা। নিজের অজ্ঞাতেই বেরিয়ে আসে এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস। হঠাৎ দেওয়াল ঘড়িতে ঠং ঠং করে সাতটা বাজতেই তাঁর সম্বিত ফিরে এল। দ্রুত চরণে ফিরে এলেন রান্নাঘরে।

চা আর জলখাবার নিয়ে আবার এলেন বিনয়ের শয্যার পাশে। ডিস ও কাপ নামিয়ে রেখে ধীরে ধীরে মশারীটা টেনে তুললেন। কিন্তু ভুলে গেলেন ডাকতে। ঘুমোক, বাংলা মায়ের দুরন্ত ছেলে একটু জিরিয়ে নিক দুর্গম চলার পথের ফাঁকে!

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল বিনয়ের।

বৌদি হেসে বললেন, 'চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

বিনয় তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে চা-পর্ব সুরু করলেন। সুরু করলেন প্রতিদিনের মত হৈ-হল্লা। রাজেনদার ছেলে-মেয়েরা এসে ভিড় করে দাঁড়ালো।

তারপর রান্নাঘরে এসে বসলেন বিনয়। রাজেনদাও। প্রতিদিনের মত আজও বাড়ীটি আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠলো।

বিনয়ের কিন্তু ভাবান্তর নেই। যে মরণ-যজ্ঞে আজ নিজেকে আহুতি দেবেন সেজন্য নেই এতটুকু চঞ্চলতা। কে বলবে যে একটু পরেই এই শান্ত, সুবোধ ছেলেটির নেতৃত্বে ইংরাজ সরকারের উপর আসবে চরম আঘাত।

বৌদি দ্রুত হাতে রান্নার কাজ সমাপ্ত করতে ব্যস্ত। বৌদি বুঝে নিয়েছেন বিনয় কি কি খেতে ভালবাসেন। তাই নানা রকম রান্নার আয়োজন করেছেন তিনি। ন'টার মধ্যেই রান্না শেষ করতে হ'বে। বিনয় চলে যাবেন।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে রসময় শূরের আবির্ভাব। বিনয় বললেন, 'আমাদের খাবার দিতে হবে বৌদি! যাত্রার সময় হয়ে এলো।'

বৌদি দু'খানা আসন পেতে বললেন, 'আমার রান্না হয়ে গেছে।'

খেতে বসলেন বিপ্লবীদ্বয়। সমস্ত স্নেহ উজাড় করে অপূর্ব নিষ্ঠায় বৌদি ওঁদের পরিবেশন করলেন। এই তো শেষ বারের মত তিনি বিনয়কে খাওয়াচ্ছেন। তাঁর মাতৃ-হৃদয় আর্তনাদ করে ওঠে যেন।

যাত্রার ক্ষণ ঘনিয়ে এল। আয়োজন চললো মহা-যাত্রার। স্যুট, পরিহিত সাহেবী পোষাকে বিনয় এসে দাঁড়ালেন বৌদির সম্মুখে। বললেন সাহেবী কায়দায়, 'Good bye, lady !'

বৌদির দু'চোখে ধারা।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে দেখলেন—হ্যাঁ, ঠিক আছে, গুলীভরা রিভলবার, পটাসিয়াম সাইওনাইডের প্যাকেট, আর এক পকেটে ছোট্ট জাতীয় পতাকা!

রাইটার্স বিল্ডিংসের সম্মুখে। ড্রাইভারের হাতে একখানা দশ টাকার নোট গুঁজে দিলেন বিনয়।

চেঞ্জের জন্য অপেক্ষা না করেই এগিয়ে চললেন সিঁড়ির দিকে। ড্রাইভার বিস্মিত নয়নে চেয়ে রইলো এই তিন সাহেবের দিকে !

বৃটিশ সরকারের বাংলার প্রধান দপ্তরখানা এই রাইটার্স বিল্ডিংস। এখান থেকেই বাংলার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। দেশকে শাসন করার নামে যত অত্যাচার, যত বর্বরতা তার মন্ত্রণালয় ইংরাজ-নিয়ন্ত্রিত এই রাজপ্রাসাদ।

বিনয়-বাদল-দীনেশ সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন দোতলায় সাহেবী কায়দায় শিষ্ দিতে দিতে। দোতলার বারান্দায় সার্জেণ্ট ফোর্ডের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ফোর্ড এঁদের উচ্চ রাজকর্মচারী মনে করে সামরিক কায়দায় অভিবাদন করলো। বিপ্লবীদের ওষ্ঠে হাসি দেখা দিল। দীনেশ অনুচ্চ কণ্ঠে সার্জেণ্টের দিকে তাকিয়ে বাংলায় বললেন, 'একটু পরেই বুঝবে মজা !'

পাশেই একটি কক্ষে নিশ্চিন্তে ফাইলে ডুবে ছিলেন বাংলার কারাসমূহের ইন্সপেক্টার জেনারেল কর্ণের সিম্পসন! পার্সনাল এ্যাসিষ্টেণ্ট রায়বাহাদুর জ্ঞান গুহ হুজুরের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন হুকুম তামিল করার অপেক্ষায়! অকস্মাৎ ঠেলা দরজা ঠেলে প্রবেশ করলেন ত্রয়ী-বীর।

মুখ তুলে চাইতে না চাইতেই শোনা গেল মেজর বিনয় বসুর বজ্রকণ্ঠ: 'Pray to God, your last moment is come... Fire !'

একই সঙ্গে গর্জে উঠলো তিনটি রিভলভার একবার নয়, দু'বার। ছটি গুলীবিদ্ধ হয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়লেন কর্ণেল সিম্পসন। ঝটিতি এগিয়ে এলেন বিনয়। পরীক্ষা করে দেখলেন !—না, মরে গেছে।

রায়বাহাদুর তখন খটখট করে কাঁপছেন। ইষ্ট নাম জপ করছেন বুঝি! ভাবছেন এবার বুঝি তাঁর পালা। কিন্তু না, তাঁর দিকে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দরজা ঠেলে বেরিয়ে পড়লেন ত্রয়ী-বীর

আবার বারান্দায়। পাশের ঘরেই ঢুকে পড়লেন আবার।

এইবার সম্বিত ফিরে এল। চিৎকার করে উঠলেন রায়বাহাদুর 'মেরে ফেললো, সাহেবকে মেরে ফেললো…'

কিন্তু ততক্ষণে সুরু হয়ে গেছে সংগ্রাম। দপ্তর থেকে দপ্তরে হানা দিয়ে ফিরছেন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স-এর তিনটি সৈনিক আর মুহুর্মুহুঃ গর্জে উঠছে তাঁদের আগ্নেয়াস্ত্র। আহত হলেন জুডিসিয়েল সেক্রেটারী টুইনহ্যাম, হোম সেক্রেটারী আলবিয়ান।

ছুটোছুটি হুটোপুটি পড়ে গেল! ঘিয়ে ভাজা কুকুরের মত ল্যাজ গুটিয়ে কেঁউ কেঁউ করে কাঁদতে কাঁদতে প্রাণভয়ে ছুটে পালাতে লাগলেন বাংলা সরকারের কূটনৈতিক স্তম্ভ আই-সি-এস' এর পাল। স্তম্ভগুলি বুঝি এবার ভেঙ্গে পড়ে আচমকা ভূমিকম্পের ধাক্কায়!

পাদ্রী জনসন চম্‌কে উঠে একবার বুঝি ভাবলেন তিনি পাদ্রী, সুতরাং বিপ্লবীরা তাঁকে দয়া করবে, যেমন হাসপাতালের ওপর হামলা চলে না রক্তাক্ত সংগ্রামের! কিন্তু তারপরই বুঝি মনে হলো, তাঁর পাদ্রী দেহের ধমনীতে তো একই ইংরাজের রক্ত প্রবহমান, সেই তো তাঁর মারাত্মক অপরাধ! সুতরাং—

সুতরাং পিছনদিকের জানালার বাইরে জলনিষ্কাশনের পাইপ বেয়ে নেমে পড়লেন তিনি, তারপর প্রাণভয়ে লম্বা দৌড়!

হোম মেম্বার প্রেটিস, বাংলার বিপ্লবীদের ঘায়েল করার জন্য যাঁর অগ্নিদাবী বক্তৃতা ব্যবস্থা পরিষদ কক্ষের দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতি-ধ্বনিত হয়ে সিংহগর্জনের মতো শোনাতো আজ তিনি শৃগালের মতো কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে আলমারীর পেছনেই আত্মগোপন করে বাঁচবার চেষ্টা করলেন। বাঁচলেনও বটে, কারণ রণোন্মত্ত বিপ্লবীদের সেদিকে চাইবার অবকাশ তখন আর ছিল না।

ইতিমধ্যে কাছেই লালবাজারে খবর পৌঁছে গেছে। বৃটিশের বাংলার সম্পদ বুঝি টলটলায়মান হয়ে উঠেছে। তাই একদল সশস্ত্র ফৌজ নিয়ে এসে পড়লেন রাইটার্স বিল্ডিংসে কোলকাতার পুলিশ কমিশনার মিঃ চার্লস টেগার্ট।

স্থরু হলো এবার সম্মুখ যুদ্ধ। টেগার্টের দল খুঁজছে আড়াল, প্রয়োগ করছে যুদ্ধের ষ্ট্রাটেজি, তাদের পাশে এসে গেছে বাক্স বোঝাই বুলেট। আর একপাশে মাত্র তিনজন, মাত্র তিনটি রিভলবার আর মাত্র কয়েক রাউণ্ড গুলী। কিন্তু এঁরাতো আর ফিরে যাবার জন্য আসেননি, তাই একেবারে খোলা বারান্দায়, সোজা দাঁড়িয়ে, সোজা-সুজি গুলী চালাতে লাগলেন।

অকস্মাৎ একটি গুলী এসে বিদ্ধ হলো দীনেশ গুপ্তের ডান বুকের ওপরের দিকে কাঁধের নীচে। ডান হাতটাও হয়ে গেল অকেজো। রক্তের ধারা বইলো। কিন্তু ক্যাপ্টেন গুপ্ত তাতে পলকের জন্যও ভ্রূক্ষেপ করলেন না, বাঁ হাতে তুলে নিলেন রিভলবার। আহত সার্জেন্টের আর্ত চিৎকারে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো দোতলার বারান্দা। এগিয়ে চললেন ত্রয়ী বীর পাসপোর্ট অফিস কক্ষের দিকে। তাঁদের বিক্রমে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো টেগার্টের ফৌজ।

কিন্তু এঁদেরও গুলী ফুরিয়ে এসেছে। সম্মুখেই নীচে নেমে যাবার সিঁড়ি। সোজা রাস্তায় নেমে যাওয়া যায়। কিন্তু বি-ভী-র জি-ও-সির কমাণ্ড 'Fight to the last man to the last bullet.' এখনও আছে, একটা করে বুলেট এখনও অবশিষ্ট আছে, আর পকেটে আছে পটাসিয়াম সাইওনাইডের প্যাকেট। জি-ও-সির কমাণ্ড, 'Let not hooligans arrest them.'

সুতরাং আর কালবিলম্ব করা যুক্তিযুক্ত নয়। লেফটেনেন্ট বাদল গুপ্ত প্যাকেট মুখে পুরে দিয়ে টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন চিরকালের মত।

শুধু প্যাকেটেই নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না মেজর বিনয় বসু, তাই সঙ্গে সঙ্গে কানের ওপর রিভলবার চেপে ধরে ট্রিগার টানলেন। মুখে উচ্চারিত হলো, বন্দেমাতরম্।

ক্যাপ্টেন দীনেশ গুপ্তের কাঁধের নীচে গুলী ঢুকে আছে। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? জি-ও-সির আদেশ Let not the hooling gans...

তাই মেজরের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন ক্যাপ্টেন। প্যাকেট মুখে ঢেলে দিয়ে আবার থুতনীর নীচে চেপে ধরলেন রিভলবার। শেষ গুলীটা গর্জন করে উঠলো।

কিন্তু কে ঢুকবে পাসপোর্ট অফিস কক্ষের ঠেলা-দরজা ঠেলে? কার আছে সে সাহস? জীবন উৎসর্গীকৃত বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স-এর সাগ্নিক সৈনিক তো নয় এরা? মৃত্যুকে যাঁরা এইমাত্র পরাজিত করে অলিন্দের সংগ্রামে আগুনের খেলা খেলে গেলেন, কে তাঁদের সম্মুখীন হবে? ··

তাই অনেক ভয় ও অনেক দ্বিধার পর অনেক সন্তর্পণে হামাগুঁড়ি দিয়ে, ঠেলাদরজার নীচে দিয়ে কক্ষের ভেতর ভীতদৃষ্টি নিক্ষেপ করলো সেই সার্জেন্ট ফোর্ড। মনে হলো, তিনজনই মৃত, আত্মাহুতি দিয়েছে।

তাই ঢুকে পড়লো ফোর্ড, ছুটে এল টেগার্ট, ছুটে এল সশস্ত্র ফৌজ ভীড় করলো সবাই এসে পাসপোর্ট অফিসকক্ষে।

কিন্তু বিনয় ও দীনেশের নিঃশ্বাস তখনও শেষ হয়নি। তখনো বুকের মধ্যে টুকটুক করে যন্ত্রটা চলছে······ঝুঁকে পড়লো আই-বি অফিসার' 'Who are you? Tell me who are you?'

চিৎকারের জবাবে চোখ মেললেন বিনয়, বললেন দৃঢ় কণ্ঠে, 'I am Benoy Bose, Major Benoy Bose of Bengal Volunters.'

'Who sent you here? কে তোমায় এখানে পাঠিয়েছে? What is his name? Tell, Tell, Tell.'

আবার চাইলেন মেজর বিনয়। এবার তাঁর চোখে অগ্নিকণা, কপালের রেখায় মূর্ত অবিমিশ্র ঘৃণা ও ধিক্কার! ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'Don't disturb, let sleep peacefully.......'

নিনয়, ও দীনেশকে তৎক্ষণাৎ কড়া পুলিশ পাহারায় এ্যাম্বুলেন্স যোগে পাঠানো হলো মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

তাঁদের বাঁচিয়ে তুলে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দিতে হবে এই হলো ইংরাজের সঙ্কল্প!

আঠার

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শায়িত বিনয়। সারা মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। হাসপাতাল পরিণত হয় যেন লালবাজারে। চারদিকে অজস্র পুলিশ পাহারা।

হাসপাতালের চারদিকে জনতার ভীড়। বীর-বাংলা, বিপ্লবী-বাংলার মৃত্যুঞ্জয়ী তরুণ যুবকদের অভিনন্দন জানাবার জন্য জনতার আগ্রহ। কিন্তু অনুমতিপত্র ব্যাতীত প্রবেশ নিষিদ্ধ। তাই দূর থেকে জানায় তাদের প্রণতি।

৯ই ডিসেম্বর প্রভাতের সংবাদপত্রের স্তম্ভে বড় বড় হরফে রাইটার্স বিল্ডিংস-এর যুদ্ধের সংবাদ। এই যুদ্ধকে ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় 'Varanda Battle' নামে অভিহিত করেছে। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে সারা সহরে, সহর থেকে সহরতলীতে, সেখান থেকে গ্রামাঞ্চলে, সে সর্ম্মান্তিক সংবাদ সমুদ্র পেরিয়ে ইংলণ্ডেশ্বরের কানে ঢেলে দেয় বুঝি গরম সিসা!

বিনয়ের মাঝে চেতনা ফিরে আসে। সহসা মনে পড়ে যায় তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা। মাকে বলেছিলেন, 'জেলে জেলে জীবন কাটাবার জন্য তোমার ছেলের জন্ম হয়নি।'

সুযোগ পেয়েই নিজের মাথার ক্ষত স্থানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেন। তৎক্ষণাৎ গল গল করে রক্তপাত আবার সুরু হয়ে যায়। ঘা বিষাক্ত হয়ে গেছে। প্রলাপ সুরু হয়ে যায়। জীবনের আশা শেষ হয়ে আসে। ডাক্তারদের চেষ্টা ব্যর্থ হতে চলে।

১৩ই ডিসেম্বর! জামসেদপুর থেকে এসে হাওড়া ষ্টেশনে ট্রেন থেকে নামলেন বিনয়ের মা-বাবা-বোন-ভাই ও ভগ্নীপতি।

মার দু'টি চোখে অশ্রুর বন্যা। হৃদয়ে কাল-বৈশাখী। মনে মনে যে আশঙ্কা এতদিন তুষানলের মতো ধিকি ধিকি জ্বলছিলো, আজ তা দেখা দিয়েছে সর্বগ্রাসী পম্পিয়াই-এর আগুনের মতো!

কি করে যেত তাঁদের আগমনের বার্তা ছড়িয়ে পড়েছে। জনতার ভীড় জমে ওঠে তাঁদের কেন্দ্র করে। বিপ্লবী পিতামাতার চরণে প্রণতি জানাবার জন্য কড়াকড়ি পড়ে যায়। সহস্র কণ্ঠে উচ্চারিত হয়, 'ধন্য মা-বাবা।'

মা-বাবা এগিয়ে চললেন গেটের দিকে, পেছনে চলে অগণিত জনতা। সবার কণ্ঠে ধ্বনিত জয়গান, 'জয়, বিনয় বসুর জয়।'

ড্রাইভারের প্রতিযোগিতা লেগে যায়। সবাই এসে অনুরোধ জানায়, 'মাগো, আমার গাড়ীতে উঠুন, মাগো—'

ট্যাক্সিতে উঠে বসেন তাঁরা। ট্যাক্সি চলতে সুরু করে। সহস্র কণ্ঠে আবার ধ্বনিত হয়, 'জয় বিনয় বসুর জয়—জয় বিনয় বসুর জয়।'

মেডিক্যাল কলেজের গেটের সম্মুখে এসে দাঁড়ায় ট্যাক্সি। পিতা রেবতীমোহন বসু ভাড়ার টাকা দিতে যেতেই ড্রাইভার সবিনয়ে টাকা ফিরিয়ে দেয়। রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, 'আপনাদের কাছ থেকে ভাড়া নিতে পারবো না। আজ আমি ধন্য, বীর-বিনয়ের মাতাপিতাকে বহন করে' এনেছে আমার ট্যাক্সি।' ড্রাইভারের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, চোখের পাতা আসে ভিজে। ভূমি স্পর্শ ক'রে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানায়। প্রণাম শুধু সে করে না, ক'রে অগণিত অপেক্ষমান জনতা। মার চরণ স্পর্শ করে ধন্য হতে চায় সবাই। বিনয় বসুর বাবা, বিনয় বসুর মা!

শুভ্র শয্যায় শুয়ে আছেন বিনয়। চেতনালুপ্ত। নিশ্চুপে শুয়ে আছেন স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক। বীরত্বের বিভা সারা অঙ্গে।

শয্যার পাশে এসে দাঁড়ান পিতা-মাতা। মার চোখে সহস্র ধারা। দৃষ্টি ঝাপসা। সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দেন। পুত্রের অসহ্য যন্ত্রণা নিজের হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে চান। মৃত্যু দিয়েও কি এ মৃত্যু রোধ করা যায় না?

চিবুক স্পর্শ করে আকুল হয়ে আর্তনাদ করে ওঠেন, 'একবার মা বলে ডাক বাবা! চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ আমি এসেছি!' আর কথা বলতে পারেন না। ভাষা স্তব্ধ হয়ে যায়।

এমন সময় পুলিশের লোক এসে দাঁড়ায়, 'আপনারা চলে আসুন, সময় পার হয়ে গেছে।' কঠিন কণ্ঠে বলে অফিসারটি।

মা উঠে দাঁড়ান। মুখের কাছে মুখ নত করে অশ্রুভাঙ্গা কণ্ঠে চিৎকার করে আবার বলেন, 'একবার তাকা, একবার তাকিয়ে দেখ বাপ, আমার।'

মাতৃ-হৃদয়ের ব্যাকুলতা বুঝি ছেলের অন্তর স্পর্শ করে। বধির কাণে বুঝি প্রতিধ্বনিত হয়, একবার তাকিয়ে দেখ। ধীরে ধীরে চোখের পাতা দুটি খুলে যায়। অপলক নয়নে তাকান মায়ের দিকে। বাঁ হাতখানা ধীরে ধীরে কপালের কাছে তুলে সামরিক স্যালুট জানান মাতাকে সৈনিক পুত্র বিনয়। তারপর সব শেষ! একটি উল্কাপাত হয়! মহাসূর্য বুঝি অন্ধকারে ডুবে যায়! পৃথিবীর শেষ দিন নেমে আসে!···

*　　　*　　　*

১৪ই ডিসেম্বর।

খবরের কাগজের স্তম্ভে স্তম্ভে স্বর্ণাক্ষরে প্রকাশিত হয় অপূর্ব বীরত্ব-গাথা। দৈনিক লিবারটির সম্পাদকীয় স্তম্ভে জ্বল্ জ্বল্ করে শিরোনাম। Benoy is dead – Long live Benoy!

জনতার মনে আগুন লেগে গেছে। রক্তে জেগেছে দারুণ উত্তেজনা। বীর শহীদের মৃতদেহের অপেক্ষায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে সবাই অশ্রুসিক্ত নয়নে। কিন্তু ভীত সন্ত্রস্ত ইংরাজ সরকার তাতেও নারাজ। মৃত বিনয়ও সরকারের মনে ভয়ের সঞ্চার করে।

অবশেষে অনেক চিন্তার পর আত্মীয়দের অনুমতি মিলে যায়। মাত্র আটজন আত্মীয়কে শব বহনের অনুমতি দেওয়া হয়।

১৪ই ডিসেম্বর অপরাহ্নে পুলিস পাহারায় তাঁরা শব বহন করে

চলেন নিমতলা শ্মশান ঘাটের দিকে। অগণিত জনতা নীরবে শবকে অনুসরণ করে। পুলিশ এসে বাধা দেয়। কিন্তু উপেক্ষা করে সব জনতা হেলাভরে সরকারের সেই আদেশ। অন্তরে জেগেছে আজ মুক্তির আনন্দ। রক্তে জেগেছে উন্মাদনা। কোন বাধাই তাদের পথ রুদ্ধ করতে পারে না।

আত্মীয়জনের কাঁধ থেকে একটি ফুলের মালার মতো জনতার কাঁধে শব চলে যায়। পুলিশদল উন্মাদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে জনতার ওপর। নির্মম হস্তে ব্যাটন চালায়। কিন্তু এ যৌবনতরঙ্গ রুধিবে কে?

হাতে তাদের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা। কণ্ঠে তাদের ধ্বনি ঃ

'বন্দে মাতরম্।'···'জয় শহীদ বিনয় বসুর জয়।'

সন্ধ্যার পর নিমতলা ঘাটে এসে উপস্থিত হয় শোকযাত্রা! এবার পুলিশ মরিয়া হয়ে লাঠি চার্জ করে বার বার। কিন্তু আঘাতকে গ্রাহ্যই করে না জনতা। রক্তের ধারা নামে, চোখের জলের সঙ্গে মিশে যায় সে রক্ত। তবুও সবাই এগিয়ে আসে শবের কাছে।

চিতা সাজানো হয়। চিতার ওপর অতি সন্তর্পণে শুইয়ে দেওয়া হয় শহীদ বিনয়কে। তারপর অগ্নি সংযোগের সঙ্গে সঙ্গে দিগন্ত কাঁপিয়ে সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ঃ 'বন্দেমাতরম্, জয় বিনয় বসুর জয়।'

আকাশে বাতাসে, বিশ্বচরাচরে, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে পরাধীন ভারতের মর্মভেদী সামগান ঃ 'বন্দেমাতরম্! জয় বিনয় বসুর জয়!'

বন্দেমাতরম্!

এই লেখকের আর একটি

স্মরণীয় বই

ওরা বিপ্লবী

আমি ফেরার